Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# সিরাহ


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবেয়া সুলতানা বৃষ্টি

রোলঃ 23100120476


৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## সিরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবেয়া সুলতানা বৃষ্টি

রোলঃ 23100120476

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সিরাহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাবেয়া সুলতানা বৃষ্টি, আইডিঃ 23100120476 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সিরাহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাবেয়া সুলতানা বৃষ্টি

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

**রাবেয়া সুলতানা বৃষ্টি**

আইডিঃ 23100120476

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র

ভূমিকা....................7
রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্ম....................8
বনু সাদ গোত্রে লালন পালন....................9
বক্ষ বিদারণ....................11
মহানবী (সাঃ) এর সম্মানীতা মাতার ইন্তিকাল....................12
মহানবী (সাঃ)-এর শামদেশ ভ্রমণ....................12
ফিজার যুদ্ধ....................13
খাদীজাহ রাঃ এর সঙ্গে বিবাহ....................13
কাবা ঘর নির্মাণ ও কুরাইশদের কর্তৃক মহানবী (সাঃ) কে সর্বসম্মতিক্রমে আল-আমীন স্বীকৃতি দান....................14
নবুওয়াত লাভ....................15
কুরআন নাজিলের সূচনা....................16
দুনিয়াতে ইসলাম প্রচার বা তাবলীগের প্রথম পর্যায়....................16
সারা আরবের বিরোধিতা ও শত্রুতা এবং মহানবী (সাঃ) এর দৃঢ়তা....................17
সারা আরবের গোত্রগুলির বিরুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর জবাব....................18
মুসলমানদের প্রথম হিজরত....................20
মুহাজীরদের ফিরিয়ে আনার জন্য আবিসিনিয়ায় কুরাইশদের দূত প্রেরণ....................20
চুক্তিনামার বিবরণ....................21
চুক্তি বাতিল হওয়ার কাহিনী....................22
শোকের বছর....................23
মহানবী (সাঃ) এর ইসরা ও মে'রাজ....................25
মদীনায় ইসলাম বিস্তারের সূচনা....................29
আকাবার প্রথম বাইয়াত....................29

আকাবার দ্বিতীয় শপথ....................................................................................30
বাইয়াতের দফাসমূহ....................................................................................31
মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরাত করার অনুমতি দান ....................................................31
মদীনায় হিজরতকারী মুসলমানদের বিবরণ ..........................................................32
মহানবী (সাঃ) এর মদীনায় হিজরত..................................................................32
রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঘরে..................................................34
পাহাড়ের গুহায় অবস্থান....................................................................................35
গারে সওর থেকে মদীনা যাত্রা ..........................................................................37
কুবায় উপস্থিতি ..............................................................................................37
মদীনায় প্রবেশ ..............................................................................................38
মাসজিদুন নাববী নির্মাণ....................................................................................39
আযান ব্যবস্থা ................................................................................................40
বদরের যুদ্ধ....................................................................................................41
আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের বৃষ্টিপাত..................................................................42
লড়াইয়ের সূচনা ..............................................................................................43
সাহাবায়ে কেরামদের আত্মোত্যাগ ........................................................................44
আবু জাহেলের পতন ........................................................................................44
যুদ্ধে ঘটিত মোজেযাসমূহ..................................................................................45
যুদ্ধের ফলাফল................................................................................................46
উহুদের যুদ্ধ (শাওয়াল, ৩য় হিজরি) ......................................................................46
দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও লড়াইয়ের শুরু ......................................................................................48
বাগ্বিতণ্ডা ও যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি ..............................................................................53
খন্দকের যুদ্ধ বা আহযাবের যুদ্ধ ..........................................................................55
গাযওয়ায়ে বনু মুসতালিক বা মুরাইসী....................................................................56

মিথ্যা অপবাদ:..........57
হুদায়বিয়ার সন্ধি..........61
খাইবারের যুদ্ধ..........63
সারিয়া মুতার এবং মক্কা বিজয়..........67
মাসজিদে হারামে প্রবেশ ও মূর্তি ভাঙন..........73
হুনাইনের যুদ্ধ (৮ম হিজরি)..........77
হিজরী সন দশম হাজুল ইসলাম বা বিদায় হজ্জ..........81
রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাত..........83
পবিত্র জীবনের শেষ দিন..........87
দাফন-কাফন..........92
উম্মুহাতুল মুমিনীনের বিবরণ..........93
রাসুলুল্লাহ-এর অনুসরণের বিভিন্ন দিক..........98
শারীরিক গঠন ও অনুপম আখলাক..........113
উপসংহার..........116

# ভূমিকা

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন, শৈশব-কৈশোর, যৌবন-বৃদ্ধকাল- জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধনী- গরীব সব শ্রেণীর মানুষের জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনীর মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
)

"বস্তুত আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ- এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।

(সুরা আহযাব:২১)

রাসূলুল্লাহ এর সর্বোত্তম চরিত্র সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ "আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।

একমাত্র রাসূলুল্লাহ এর সুমহান আদর্শের অনুসরণের মাঝেই রয়েছে দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ ও সফলতা। কেবল তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে বান্দা লাভ করতে পারে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল কে সম্বোধন করে বলেছেন-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও; তাহলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ তাআলা বড় ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।"

(সূরা কলাম: ৪)

যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামগণকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন তাঁদের আদর্শের অনুসরণে তাঁদের উম্মাতগণ নিজ নিজ জীবন পরিচালনা করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন

-وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

"আমি (প্রত্যেক) রাসূলকে শুধু এ জন্যই প্রেরণ করেছি; যাতে আল্লাহর হুকুমে (দুনিয়াবাসী) তাঁর অনুসরণ করে চলে।
(সুরা নিসা:৬৪)

যেহেতু রাসূলুল্লাহ-ই (ﷺ) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কেউ নবী কিংবা রাসূল হিসেবে আগমন করবেন না। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের আগমন ঘটবে; প্রত্যেকের উপরই ফরয হলো রাসূলুল্লাহ এর আনুগত্য করা। তাঁরই আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের জন্য, তাঁরই সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভের জন্য; সর্বোপরি জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতের উঁচু মর্যাদা লাভের লক্ষ্যে আমাদেরকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ এর পবিত্র সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে।

তাঁরই দেখানো পথে দ্বীনের উপর অটল-অবিচল থাকতে হবে। কিন্তু আমরা যদি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনচরিত সম্পর্কেই না জানি; তাহলে কীভাবে তাঁর অনুসরণ করবো? কীভাবে তাঁর পথে চলবো? অতএব প্রত্যেক মুমিনের উপরই আবশ্যক হলো,রাসূলুল্লাহ এর জীবনচরিত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, তাঁর মহান আদর্শ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য সীরাতের কিতাবাদি অধ্যয়ন করা। তাহলে আমরা সহজেই জানতে পারবো- দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে কেমন ছিলো রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাহ? দ্বীনকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেমন ছিলো তাঁর পথ ও পন্থা? সর্বোপরি আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো- দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন (আমীন)

## রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্ম

আমুল ফীল অর্থাৎ হস্তীবাহিনী নিয়ে আবরাহার কা'বা অভিযানের ঘটনা যে বছর ঘটে, সেই বছরের রবিউল আউয়াল মাসের দ্বাদশ রজনী অতিক্রান্ত হবার শুভ মূহুর্তে সোমবারে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন।

কায়েস ইবনে মাখরামা থেকে থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি ও রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাহার হামলার বছর জন্মগ্রহণ করেন।

হাসসান ইবনে সাবিত বলেন,

আমি তখন সাত আট বছরের বালক হলেও বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছি।যা শুনতাম তা বুঝতে পারার ক্ষমতা তখন হয়েছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম জনৈক ইহুদী ইয়াসরিবের একটা দুর্গের ওপর উঠে উচ্চস্বরে 'ওহে ইহুদী সমাজ!' বলে চিৎকার করে উঠলো।লোকেরা তার চারপাশে জমায়েত হয়ে বললো, তোমার কি হয়েছে? সে বললো, "আজ রাতে আহমাদের জন্মের সেই নক্ষত্র উদিত হয়েছে।"

অতঃপর হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ট হলে তাঁর মা আমিনা তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট এই বলে খবর পাঠালেন যে,আপনার এক পৌত্র জন্মেছে। আসুন,তাঁকে দেখুন। আবদুল মুত্তালিব এলেন, এসে তাকে দেখলেন। এই সময় আমিনা তাঁর গর্ভকালীন সময়ে দেখা স্বপ্নের কথা, নবজাতক সম্পর্কে যা তাকে বলা হয়েছে এবং তাঁর যে নাম রাখতে বলা হয়েছে তা সব জানালেন।

অতপঃর আবদুল মুত্তালিব তাকে নিয়ে কাবা শরীফে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর শিশুকে তাঁর মায়ের কাছে দিয়ে ধাত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন।

(ইবনে হিসাম)

## বনু সাদ গোত্রে লালন পালন

আব্দুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দুগ্ধ পান করানোর উদ্দেশ্য হালীমাহ বিনতে আবূ যুয়াইব এর নিকট সমর্পণ করেন। এ মহিলা বনু সাদ বিন বাকর গোত্রের একজন খাতুন ছিলেন।দুগ্ধ পানকালে বিবি হালিমা নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অলৌকিক ও বরকতময় অনেক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে হতবাক হয়ে যান।

তিনি বলেন, আমি আমার একটি সাদা মাদী গাধার পিঠে সওয়ার হয়েছিলাম।আমার সঙ্গে উটও ছিল।কিন্তু কি আল্লাহর মহিমা যে,উটের উলান থেকে এক বিন্দুও দুধ বের হচ্ছিল না।

আমার বুকেও শিশুটির জন্য এক ফোটা দুধ ছিলনা। এদিকে ক্ষুধার তাড়নায় শিশুটি এতই ছটফট করছিল যে, আমরা সারারাত ঘুমাতে পারিনি। আমার গাধাটি ছিল দুর্বল। শক্তিহীনতার কারণে সে এতই ধীরে ধীরে চলতে থাকল যে এতে কাফেলার অন্যরা বিরক্ত এবং বিব্রত বোধ  করতে থাকলো।

যাহোক এমনভাবে আমরা মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। এবং শিশু মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে নিজ আস্তানায় ফিরে এলাম।

তাকে যখন কোলে রাখলাম সে এবং তার দুধ ভাই পূর্ণ পরিতৃপ্তির সাথে দুধ পান করল এবং উভয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এর পূর্বে তার এভাবে ঘুম আমরা কখনও দেখিনি। অন্যদিকে আমার স্বামী উট দোহন করতে গিয়ে দেখেন যে তার ওলান দুধে পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি এত বেশি পরিমাণে দুধ দোহন করলেন যে আমরা উভয়েই পেট পুরে তা পান করলাম।

আমার স্বামী বললেন হালিমা আল্লাহর শপথ তুমি একজন মহা ভাগ্যবান সন্তান লাভ করেছো। উত্তরে বললাম আল্লাহ শপথ অবস্থা দেখে আমারও যেন তাই মনে হচ্ছে।

হালিমা আরো বলেন এরপর আমরা রওনা দিলাম। কিন্তু আল্লাহ শপথ  আমার সেই দুর্বল গাধাই সকলকে পেছনে ফেলে দ্রুত বেগে সকলের অগ্রভাগে এগিয়ে যেতে থাকলো। আমার অন্য সঙ্গীরা বলল এটা কি সেই গাধা নয় যার ওপর সওয়ার হয়ে তুমি এসেছিলে?আমি বললাম নিশ্চয়ই এটাই সেই।তারা বললো এর সঙ্গে বিশেষ রহস্যজনক কোন ব্যাপার ঘটেছে।
এরপর আমরা বনু সাদ গোত্রের নিজ বাড়িতে উপস্থিত হলাম।আমাদের অঞ্চলের মানুষের চেয়ে অন্য কোন অঞ্চলের মানুষ অভাবগ্রস্ত ছিল না।

কিন্তু মক্কা থেকে আমাদের ফিরে আসার পর আমাদের বকরিগুলো চারণভূমি খেয়ে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে দুগ্ধ পরিপূর্ণ ওলান সহকারে বাড়িতে ফিরে আসত। দোহন করে তৃপ্তি সহকারে আমরা দুধ পান করতাম।অথচ অন্য লোকেরা দুধ পেতনা এক ফোঁটাও।

এভাবেই সেই ছেলের পুরো দুটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। দু'বছর হতে না হতেই তার দেহ বেশ শক্ত ও সুঠাম হয়ে গড়ে উঠল।লালন পালনের মেয়াদ দু'বছর পূর্ণ হতে আমরা তাকে তার মাতার নিকট নিয়ে গেলাম।

কিন্তু আমাদের গোপন ইচ্ছা ছিল যে তাকে আমরা আরো কিছুদিন নিজেদের কাছে রাখবো। তার মায়ের কাছে এই গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করলে,আমাদের বারবার অনুরোধ ও আন্তরিকতায় বিশ্বস্ত হয়ে তিনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুনরায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দান করলেন।

(ইবনে হিসাম)

## বক্ষ বিদারণ

ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা মতে,দ্বিতীয় দফায় বনু সা'দ গোত্রে অবস্থানকালে কয়েক মাস পর পক্ষান্তরে মুহাক্কিকগণের বর্ণনা জন্মের ৪র্থ কিংবা ৫ম বছরে তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি ঘটে।আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত -একদিন বালক নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সঙ্গী- সাথিদের সঙ্গে খেলাধূলা করছিলেন এমন সময় জিবরাঈল আলাইহিসসালাম সেখানে এসে উপস্থিত হন।তারপর তাঁকে একটু দুরে নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন এবং তার বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিন্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তার মধ্যে থেকে কিছুটা জমাট রক্ত বের করে নিয়ে বললেন, এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ যা তোমার মধ্যে ছিল। তারপর হৃৎপিণ্ডটিকে একটি সোনার তস্তরিতে রেখে যমযমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে কাটা অংশ জোড়া লাগিয়ে দিলেন।

(সিরাহ)

# মহানবী (সাঃ) এর সম্মানীতা মাতার ইন্তিকাল

যখন মহানবী (সাঃ) এর বয়স ছয় বৎসর, তখন মদীনা থেকে ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে তাঁর সম্মানীতা মাতা দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। বাল্যকাল, বয়স ছয় বৎসর। পিতার ছায়াতো পূর্বেই উঠে গিয়েছিল। মায়ের স্নেহের কোলও আজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এই এতীম শিশুট আম্বিয়া রহমতের কোলে লালন পালন হওয়ার অপেক্ষায় ছিল।

## আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল

পিতা-মাতার পর মহানবী (সাঃ) তাঁর দাদা আঃ মুত্তালিবের আশ্রয়ে ছিলেন কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা দেখতে চেয়েছিলেন যে, এই নব জাতক শুধু রহমতের কোলেই লালিত পালিত হবে। সমস্ত কার্য কারণের কারক যিনি (আল্লাহ) তিনি স্বয়ং লালন পালনের জিম্মাদার হলেন। যখন তাঁর বয়স আট বৎসর দুই মাস দশ দিন হল, তখন আঃ মুত্তালিবও পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

# মহানবী (সাঃ)-এর শামদেশ ভ্রমণ

তারপর মহানবী (সাঃ) এর আপন চাচা আবু তালেব তাঁর অভিভাবক হলেন। এবং তিনি তার আশ্রয়ে বসবাস করতে থাকেন। এমন কি তাঁর বয়স বার বৎসর দুইমাস দশদিন হল, তখন আবু তালেব ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম (সিরিয়া) দেশ ভ্রমন করার ইচ্ছা করলেন এবং মহানবী (সাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে শাম দেশের দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তাইমা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন।

## তাঁর সম্পর্কে এক ইহুদী পন্ডিতের ভবিষ্যৎ বানী

তিনি তাইমা নামক স্থানে অবস্থান করতে ছিলেন, ঘটনা ক্রমে ইহুদী এক বড় পণ্ডিত যাকে বুহায়রা রাহেব বলা হত। সে মহানবী (সাঃ) এর নিকট দিয়ে গমনকালে তাঁকে

দেখে আবু তালেবকে সম্বোধন করে বলল "আপনি কি তার প্রতি দয়া পোষন করেন এবং তাঁর হেফাযত কামনা করেন?" আবু তালেব বলল নিশ্চই একথা শুনে বাহীরা রাহেব আল্লাহর কছম করে বলল যে, "আপনি যদি তাঁকে শাম দেশে নিয়ে যান তাহলে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। কেননা, ইনি আল্লাহর নবী যিনি ইহুদী ধর্মকে বিলুপ্ত করে দিবেন। আমি তাঁর গুনাবলী সমূহ আসমানী কিতাবের মধ্যে দেখতে পেয়েছি।অতঃপর তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি স্বদেশে ফিরে গেলেন।

## ফিজার যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিশ বছরের তরুণ,তখন ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।ফিজার যুদ্ধ নামকরণের কারণ এই যে,এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কিনানা ও কাইস ঈলান গোত্রদ্বয়ের উভয়ই তাদের পরস্পরের নিষিদ্ধ জিনিসসমূহ লংঘন করেছিল। দিনের প্রথম অংশে যুদ্ধে কাইস কিনানাকে পরাজিত করে। কিন্তু দিনের মধ্যাহ্ন ভাগে কিনানা জয়ী হয়।

## খাদীজাহ রাঃ এর সঙ্গে বিবাহ

খাদীজাহ( রদিয়াল্লাহু আনহা) এর ব্যবসার উদ্দেশ্যে )সিরিয়া থেকে যুবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রত্যাবর্তনের পর ব্যবসা-বাণিজ্যের খতিয়ান করা হলো। হিসাব নিকাশ করে আমানত সহ এত বেশি পরিমাণ অর্থি তিনি পেলেন ইতোপূর্বে কোনদিনই তা পায়নি। খাদীজাহ রাঃ এর দাস মায়সারার কথাবার্তা শুনে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিষ্টভাষী তার সত্যবাদিতা উন্নত চিন্তাভাবনা আমানত হেফাজত করার ব্যাপারে একাগ্রতা ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ এবং তাকে পতি হিসেবে পাওয়ার একটা গোপন বাসনা জেগে ওঠে। তার বান্ধবী নাফিসা বিবি খাদিজা এর প্রস্তাব সম্পর্কে নবী করিম (সাঃ)এর সঙ্গে আলোচনা করেন। নবীজি এ ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করে বিষয়টি চাচা আবু তালিবের সঙ্গে আলোচনা করলেন। অতঃপর

এক শুভক্ষণে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত দুটি প্রাণ বিশ্বমানের অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়।

তিনি সহধর্মিনী খাদিজাকে মোহরানা স্বরূপ ২০ টি উট প্রদান করেন। ওই সময় খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর বয়স হয়েছিল 40 বছর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তানদের মধ্যে ইব্রাহিম ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিলেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর গর্ভজাত সন্তান। নাবী দম্পত্তির প্রথম সন্তান ছিলেন কাশেম,তাই উপনাম আবুল কাশেম। তারপর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যায়নাব,রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম,ফাতিমা ও আব্দুল্লাহ।আব্দুল্লাহর উপনাম ছিল ত্বাইয়িব এবং ত্বাহির।

## কাবা ঘর নির্মাণ ও কুরাইশদের কর্তৃক মহানবী (সাঃ) কে সর্বসম্মতিক্রমে আল-আমীন স্বীকৃতি দান

মহানবী (সাঃ) এর বয়স যখন পয়ত্রিশ বৎসর হল তখন কুরাইশগণ বায়তুল্লাহকে নতুন করে মেরামত করার ইচ্ছা করল। বায়তুল্লাহর মেরামত কাজে অংশ গ্রহণ করা প্রত্যেক মানুষ নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করত। কুরাইশ বংশের প্রতিটি শাখা গোত্র নিজেদের সৌভাগ্যের ফয়সালা এর উপর করত যে, বায়তুল্লাহ মেরামত কাজে কে কত অংশ নিতে পারে। সুতরাং এই মেরামত কাজে কোন ঝগড়া যেন না হয়। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত গোত্র সমূহের মধ্যে মেরামত কার্যকে বন্টন করে দিলেন। এ বন্টন পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ মেরামাত কাজ 'হাজারে আসওয়াদ' বসাবার স্থান পর্যন্ত পৌছে গেল। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ কে উঠিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করার ব্যাপারে গোত্র সমূহের মধ্যে চরম মতানৈক্য দেখা দিল। প্রত্যেক গোত্র ও ব্যক্তির খাহেশ ছিল যে, এই সৌভাগ্য অর্জন কিভাবে করা যায়। এমন কি তা নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে অঙ্গিকার নিতে লাগল। কওমের চিন্তাশীল ব্যক্তি বর্গ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি মীমাংসার পন্থা বের করতে মসজিদে সমবেত হলেন।

আলাপ আলোচনায় এই ফয়সালা হল যে, যে ব্যক্তি আগামী কাল ভোরে সর্ব প্রথম এ মসজিদের দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে এর মিমাংসা দিবেন এবং তার এই হুকুম বা মিমাংসা কে খোদায়ী মিমাংসা মনে করে সকলেই মেনে নিবে। খোদার মহিমায় সর্ব প্রথম মহানবী (সাঃ) সেই দরওয়াজা দিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করলেন। তাকে দেখেই এক বাক্যে সবাই বলে উঠল "ইনি আমাদের আল-আমীন"। আমরা তার ফয়সালা মেনে নিতে রাজি আছি। মহানবী (সাঃ) তাশরীফ আনলেন এবং এমন অভিজ্ঞতা পূর্ণ ফয়সালা করলেন যে, সকলেই খুশী হয়ে গেল। অর্থাৎ তিনি একটি চাদর নিজ হাতে বিছিয়ে তাতে হাজরে আসওয়াদ (কালপাথরটি) রেখে দিলেন এবং হুকুম দিলেন যে, প্রত্যেক গোত্রের মনোনীত ব্যক্তিরা যেন চাদরের এক এক কোন ধরে নেয়। এভাবে তাই করা হল। চাদর হাতে পাখরখানা যথাস্থানে রেখে দিলেন। ইবনে হিশাম এই ঘটনাটি বর্ণনা করবার পর লিখেছেন যে, নবুওয়তের পূর্বে সমস্ত কুরাইশগণ তাকে 'আল-আমীন' বা 'অতি বিশ্বাসী' বরে অভিহিত করত।

(সীরাতে ইবনে হিসাম, ১ম খন্ড,)

## নবুওয়াত লাভ

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন 40 বছর হলো, আল্লাহ তাকে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য করুনা স্বরূপ এবং গোটা মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা করে পাঠালেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন ফোন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করতে ও মানবজাতিকে তার দ্বারা অনবৃহীত করতে মনস্ত করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের অংশ হিসেবে নির্ভুল স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তখন তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের সূর্যোদয়ের মতোই বাস্তব হয়ে দেখা দিত। অতঃপর রমযান মাসে তিনি যখন হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন, তখন তার কাছে আল্লাহর তরফ থেকে পরম সম্মান ও মর্যাদার বাণী বহন করে জিবরাইল আলাইহিস সালাম এলেন।

ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ ও পরস্পর সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে মু'মিনদের যখন একটি দল সৃষ্টি হলো, এক সালাতের বোঝা বহনের মতো যোগ্যতা অর্জিত হলো ও ইসলাম তার নিজ অবস্থানকে কিছুটা শক্তিশালী করছে  সক্ষম হলো তখন রাসূলুল্লাহ প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও বাতিল দ্বীন, উপাস্যদেরকে উত্তম পন্থায় প্রতিহত করতে আদিষ্ট হলেন।

এ বিষয়ে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার এ বাণী অবতীর্ণ হয় :

]وَأَنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِين(٢١٤]  (َ

'আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।' (আশ-শু'আরা ২৬: ২১৪)

## কুরআন নাজিলের সূচনা

মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন রমজান মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে মানবজাতির জন্য পথ নির্দেশক রুপে, হেদায়াতের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ সহকারে হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী হিসেবে। মহান আল্লাহ আরো বলেন আমি এই কোরআন লাইলাতুল কদরের নাযিল করেছি। লাইলাতুল কদর কি তুমি কি তা জানো ? লাইলাতুল কদর সহজ মাসের চেয়ে উত্তম। এ রাতে ফেরেশতাগণ ও জিবরাঈল অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছায় এবং প্রভাত হওয়া পর্যন্ত এরা শান্তিময় হয়ে থাকে।(সূরা কদর)

## দুনিয়াতে ইসলাম প্রচার বা তাবলীগের প্রথম পর্যায়

প্রথমত  মহানবী (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিল হয়, তখন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি আদিষ্ট ছিলেন না। বরং তাকে শুধু তার ব্যক্তিগত হুকুম-আহকাম ছিল। অতঃপর কিছুদিন ওহী অবতরণ বন্ধ থাকার পর দ্বিতীয় পর্যয়ে যখন ওহী অবতরণ শুরু হল, তখন তাতে মহানবী (সাঃ) কে তাবলীগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। কিন্তু

পৃথিবীতে ছিল তখন অজ্ঞতা ও পথ-ভ্রষ্ঠতার ছড়াছাড়ি। বিশেষ করে আরবদের অহংকার ও গর্ব এবং পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুসরণ তাদের সত্যের আহ্বানে কর্ণপাত করার সুযোগ কখনও দিতনা।

এই জন্য প্রথমে আল্লাহ তা'আলার হেকমতের ইচ্ছা ছিল যে, মহানবী (সাঃ) কে প্রকাশ্যে তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারের নিদের্শ না দেওয়া যাতে শুরু থেকেই মানুষ ইসলামের প্রতি বিদ্ধেষপরায়ণ না হয়ে পড়ে। সুতরাং মহানবী (সাঃ) প্রথমত তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, এবং যাদের প্রতি তার আস্থা ছিল অথবা নিজের দূরদর্শিতার দ্বারা যাদের মধ্যে পূণ্য ও মঙ্গলের নিদর্শন দেখতেন তাদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে লাগলেন। এই দাওয়াতী পন্থায় সর্ব প্রথম তার পবিত্রতমা স্ত্রী হযতর খাদীজা (রাঃ-আনহা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), চাচাত ভাই হযরত আলী( রাঃ) এবং আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ইসলামের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক নবুওয়ত পাওয়ার পূর্ব থেকেই মহানবী (সাঃ) এর বন্ধু ছিলেন। এবং তার সত্যবাদীতা বিশ্বস্ততা ও সচ্চরিত্র সম্পর্কে খুব অবগত ছিলেন। মহানবী (সাঃ) যখন তাকে খোদায়ী রিসালাতের সুসংবাদ দিলেন সত্বর তখন তিনি তার সত্যতা মেনে নিয়ে নিলেন। এবং কালেমা শাহাদাৎ পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

(সিরাতে মোগলতাঈ,)

## সারা আরবের বিরোধিতা ও শত্রুতা এবং মহানবী (সাঃ) এর দৃঢ়তা

এ দাওয়াত ও তাবলীগের ধারা এমনি ভাবে অব্যাহত ছিল। আরবরা যখন জানতে পারল যে, মহানবী (সাঃ) এর ওহীতে তাদের মূর্তিগুলির রহস্য উদঘাটন করে দেওয়া হয়েছে এবং মুর্তিপুজারীদের অজ্ঞতা প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে শত্রুতা শুরু করে দিল। তাদের একটি দল তার চাচা আবু তালিবের নিকট এসে বলল যে, তিনি যেন তাকে এধরনের কথা বলা হতে বিরত রাখেন এবং তার সাহায্য ও সহযোগিতা ছেড়ে দেন। আবু তালিব সু-কৌশলে তাদেরকে জবাব দিয়ে দিলেন। মহানবী (সাঃ) এভাবে সত্যের কালেমা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত প্রসার

করে যেতে লাগলেন এবং মূর্তিপূজা হতে মানুষকে বাধা দিতে থাকলেন। আরবরা যখন অধৈর্য্য হয়ে পড়ল, তখন আবার আবু তালেব নিকট এল এবং অত্যন্ত কঠোরতার সাথে তার নিকট দাবী জানাল যে, "আপনি হয়ত আপনার ভাতিজাকে বিরত রাখুন নতুবা আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। যতক্ষণ না দুই দলের ধ্বংস হয়ে যাবে।"

## সারা আরবের গোত্রগুলির বিরুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর জবাব

এবার আবু তালিবও চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি মহানবী (সাঃ) এর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করলেন। মহানবী (সাঃ) বললেন, "হে সম্মানিত চাচা, আল্লাহর কসম! আরবের মূর্তিপূজারীরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রকে রেখে দেয় এবং চায় যে, আমি আল্লাহর কালিমা তার মাল্লুকের নিকট পৌছানো থেকে বিরত থাকি। তথাপি কখনো আমি তা মেনে নিতে প্রস্তুত না। যতক্ষন না আল্লাহর সত্য দ্বীন মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করবে অথবা আমি এই সংগ্রামে নিজের জীবন দিয়ে দিব।" আবু তালেব যখন মহানবী (সাঃ) এর এই অবস্থা দেখলেন, তখন বললেন "আচ্ছা যাও, তুমি নিজের কাজ চালিয়ে যেতে থাক আমিও তোমার সাহায্য সহযোগিতা থেকে কোন সময় বিরত হব না।"

কুরাইশরা যখন দেখল যে, তাদের কোন কৌশলই কার্যকরী হচ্ছে না, তখন তারা পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত করল যে, তারা তাদের সবচেয়ে চালাক সর্দার উতবা ইবনে রবীয়াকে মহানবী (সাঃ) এর নিকট প্রেরণ করবে। সে তাকে প্রত্যেক প্রকারের দুনিয়াবী প্রলোভন দেখিয়ে বশ করতে চেষ্টা করবে। সম্ভবতঃ এই তদ্বীরের কারণে তিনি দ্বীন প্রচারের বিরত থাকবেন।

উতবা ইবনে রবীয়া মহানবী (সাঃ) এর খেদমতে যখন হাজির হল, তখন তিনি মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন। সে নিকটে গিয়ে বলল "ভাতিজা! তুমি বংশগত দিক দিয়ে আমাদের সবার চেয়ে উত্তম। এতসত্বেও তুমি নিজের গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি

করে দিচ্ছ। তাদের পূর্ব পুরুষদের কে মূর্খ প্রতিপন্ন করছ। তোমার এই সব কাহিনীর উদ্দেশ্য যদি অধিক অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করা হয়ে থাকে, তাহলে শোন! আমরা তোমার জন্য এত অধিক অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করে দিতে প্রস্তুত যে, তুমি মক্কার সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে। আর যদি তোমার বাসনা এ হয় যে, তুমি একজন সরদার হবে। তাহলে আমরা তোমাকে সারা কোরইশ গোত্রের সরদার বানিয়ে দিব। তোমার আদেশ ছাড়া একটি কনাও আমরা নড়াবনা।

এবং তোমার উদ্দেশ্যে যদি বাদশাহী লাভ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানাতে পারি। আর যদি তোমার উপর (নাউযুবিল্লাহ) জ্বীনের কোন প্রভাব থাকে এবং যে সব কথা মানুষকে পড়ে শুনাচ্ছ তা তারই কথা হয়ে থাকে, অথচ তুমি তার হাত হতে পরিত্রাণ লাভ করতে অক্ষম হয়ে পড়ছ। তা হলে আমরা তোমার জন্য একজন চিকিৎসক তালাশ করব যে তোমাকে সুস্থ করে তুলবে।"
(সীরাতে মোগলাতাঈ)

যখন উত্তবা তার বক্তব্য শেষ করল, তখন মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সমস্ত আবেদনের জবাবে শুধু কোরআনের একটি সূরা তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন। যা শুনে উতবা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং নিজ গোত্রের কাছে ফিরে এসে বলল "খোদার কসম! আজ আমি এমন কালাম শুনেছি এর পূর্বে জীবনে কখনও তা শুনি নাই। খোদার কসম! ইহা কোন কবিতা ও নয়, গল্পের কোন কথাও নয় এবং যাদু মন্ত্রও নয়। আমার রায় হল এই যে, তোমরা সকলে এই লোক টিকে (মুহাম্মদ সাঃ) কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাক। কেননা আমি তার যে কালাম শ্রবণ করেছি, আল্লাহর কসম! এর সুমহান মর্যাদা প্রকাশিত হবে। আমি তোমাদের ভাল চাই।
তোমরা আমার কথা শুন এবং বেশী একটা মানতে না চাও তাহলে কিছু দিন অপেক্ষা কর। যদি আরবগণ বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে তোমরা বিনা পরিশ্রমেই এই বিপদের হাত হতে নাজাত পেয়ে যাবে। আর যদি সে আরবগণের উপর বিজয়ী হয় তাহলে তার সম্মান আমাদের সম্মান। কেননা সে আমাদের গোত্রেরই লোক।" কুরাইশরা তাদের সবচেয়ে সতর্কবান সরদারের কথাগুলি শুনে অবাক হয়ে গেল এবং এই বলে জান বাঁচাল যে, তার উপর মুহাম্মদ (সাঃ) যাদু করেছে।
(দুরুসুস্ সীরাত)

## মুসলমানদের প্রথম হিজরত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন তার সাহাবীদের ওপর অসহনীয় নির্যাতন চলছে। এ অবস্থায় তিনি সাহাবীদেরকে বললেন তোমরা যদি আবিসিনিয়ায় চলে যাও মন্দ হয় না। সেখানে একজন রাজা আছেন যার রাজত্বে কারো উপর জুলুম নিপীড়ন হয় না। এ দেশটা সত্য ও ন্যায়ের আশ্রয়স্থল। এই উপদেশ অনুসারে সাহাবাগণ তে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হবার আশঙ্কায় এবং নিজের দিন ও ঈমানকে বাঁচানোর তাগিদে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণের জন্য আবিসিনিয়ায় চলে গেলেন।ইসলামের অভ্যুদয়ের পর এটাই প্রথম হিজরত।

## মুহাজীরদের ফিরিয়ে আনার জন্য আবিসিনিয়ায় কুরাইশদের দূত প্রেরণ

কুরাইশগণ যখন দেখল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ আবিসিনিয়ায় গিয়ে নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করছেন এখন তারা সিদ্ধান্ত নিল নাজাশির নিকট দুজন যোগ্য দূত পাঠাবে।এতে নাজাশী তাদেরকে সেখান থেকে ফেরত পাঠাবে এবং তারা তাদেরকে ধর্মান্তরিত করার সুযোগ পাবে। এ উদ্দেশ্যে লোক পাঠালো তারা হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রাবিআ ও আমর ইবনুল আস ইবনে ওয়াইল। নাজাশির সাথে কথাবার্তা বলার আগে তারা প্রতিটি দরবারী ও রাজ কর্মচারীকে উপঢৌকন দিল। এবং তাদের নামে খারাপ কথা বলতে থাকলো। তারা বলল হে বাদশাহ,আমাদের দেশ থেকে কতিপয় নির্বোধ যুবক আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে।তারা তাদের স্বজাতির ধর্ম ত্যাগ করেছে এবং আপনার ধর্ম গ্রহণ করেনি।
তারা একটা উদ্ভট ধর্ম উদ্ভাবন করে নিয়েছে যা আপনার ও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তাদেরকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করুন। উম্মে সালামা বলেন অতঃপর নাজাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের ডেকে পাঠালেন। নাজাশী সাহাবিদের কে বললেন তোমাদের সেই ধর্মটা কি? যা গ্রহণ করে তোমরা নিজ জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং আমাদের ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করনি? জাফর ইবনে আবু তালিব বললেন হে বাদশা অঙ্গজাতি আমরা মূর্তি পূজা করতাম এমতাবস্থায় আল্লাহ

আমাদের কাছে আমাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তিকে নবী করে পাঠালেন। জাফর আরো বললেন আমরা তার আহবানে সাড়া দিয়ে তার প্রতি ঈমান আনলাম। তিনি আল্লাহ তরফ থেকে যে সব বিধান দিলেন তার অনুসরণ করতে লাগলাম। নাজাশী বললেন তোমাদের নবী আল্লাহর যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা আমাকে পড়ে শোনাও। জাফর সূরা মারিয়াম এর প্রথম থেকে কতিপয় আয়াত পড়ে শোনালেন।নাজাশী আয়াতগুলো শুনে কাদতে লাগলেন। তার সাথে ধর্মযাজকরাও কাঁদতে লাগলেন।

এরপর নাজাসি বললেন আমি নিশ্চিত যে এই বাণী এবং ঈসার কাছে যে বাণী আসতো উভয় একই উৎস থেকে নির্গত। হে কুরাইশ দূতদ্বয় তোমরা বিদায় হও। আমি কিছুতেই ওদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করবো না।

## চুক্তিনামার বিবরণ

কুরাইশরা দেখল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ একটা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় পেয়েছে।এবং তারা দেখল উমার ইসলাম গ্রহণ করেছে। ফলে ওমার ও হামজার মত লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচরদের দলভুক্ত হয়েছে। এবং ইসলাম মক্কার পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এসব দেখে তারা পুনরায় মিলিত হলো এবং এই মর্মে একটা চুক্তি নামে স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত নিল যে, বনো হাসিম ও বনু আব্দুল মোতালিব গোত্রের সাথে অবশিষ্ট কুরাইশগণ এখন থেকে আর কোন বিয়ে-শাদী ও বেচাকেনা করবে না।

একটি সম্মেলন আহবান করে তারা এই চুক্তিনামা সম্পাদন ও স্বাক্ষর করলো। এরপর চুক্তিনামাটি কাবা শরীফের ভেতরে ঝুলিয়ে রাখলো যাতে তাদের মনে ওটার গুরুত্ব ও প্রভাব বেশি হয়।
মানসূর ইবনে ইকরামা এই চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বদ দোয়ায় তার কয়েকটি আঙ্গুল ও অসাড় হয়ে যায়।

এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর বনু  আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের লোকগণ আবু তাখলিবের শরণাপন্ন হয়। এবং তারা সবাই গিরিবর্তে প্রবেশ করলো। উপর দিকে বুনো হাসিম গোত্র থেকে  আবু লাহাব বেরিয়ে গেল এবং বৈরী কুরাইশদের পক্ষ সমর্থন করল।
বনু আব্দুল মোত্তালিব ও বনু ও হাসিম গোত্রোদের অবরোধ জীবনযাপন চলে দুই বা তিন বছর। এ সময় তারা অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করেন। দুই একজন সহৃদয় কুরাইশ আত্নীয়ের গোপন সহযোগিতা ছাড়া কিছুই তাদের কাছে পৌঁছাতে না।

## চুক্তি বাতিল হওয়ার কাহিনী

বনু হাসিম ও বনু মুত্তালিবকে গিরিবর্তে অবরোধ করে রাখার লক্ষ্যে কুরাইশ গণ যে চুক্তিনামায় সই করে, কুরাইশদের একটি দল অবশেষে তা বাতিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব হিসাম ইবনে আমর এর। হিসাম বনু মুত্তালিবের কাছে আসতেন ও তাদেরকে উটের পিঠে করে এনে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতেন।
একদিন তিনি যুহাইর ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরার কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন হে যুহাইর,তুমি নিজে তো খেয়ে পড়েও স্ত্রী প্রিয়জন নিয়ে দিব্যি সুখে আছো অথচ তোমার মামারা কোথায় কিভাবে আছেন তাও তোমার জানা আছে, তারা বয়কট অবস্থায় রয়েছেন। যুহাইর বললেন,আমি একা কি করতে পারি?আর একজন লোক ঠিক করো।এভাবে হিসাম মুতয়িম ইবনে আদীর কাছে গিয়েও বললেন।

অতঃপর বুখতারী ইবনে হিশামের কাছে গেল।তার কাছে গিয়ে সে মুতয়িমকে যা বলেছি তারই পুনরাবৃত্তি করলো।তারপর যামআ ইবনে আসওয়াদের কাছে গেল।এরপর মক্কার উচ্চভূমিতে হাজ্জন নামক পর্বতের পাদদেশে তারা সমবেত জমায়েত হলো এবং চুক্তিনামাটা বাতিল করানোর জন্য তোড়জোড় শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলো।পরদিন সকালে তারা কোরাইশদের সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে, সাতবার কাবা তাওয়াফ করে জনতার কাছে এসে বললো, হে মক্কাবাসী আমরা খাবো পরবো,আর বনু হাশিম অবরুদ্ধ অবস্থায় ধুঁকে ধুঁকে মরে যাবে,এটা কি করে চলতে পারে? আল্লাহর

শপথ, এই সম্পর্ক -বিনাশী ও যুলুমের প্রচারনা দানকারী চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলার আগে আমি ক্ষান্ত হবোনা।আবু জাহেল বলে উঠলো,আল্লাহর শপথ,ওটা ছেঁড়া হবেনা।

আবু জাহেল যখন একথা বলছিলো তখন আবু তালিব মসজিদের এক কোণে বসে ছিলেন।মুতয়িম চুক্তিনামাটা ছিঁড়ে ফেলার জন্য এগিয়ে গেলো।কিন্তু ওটা হাতে নিয়ে দেখলো একমাত্র বিসমিকা আল্লাহুম্মা এই শব্দটা ছাড়া সমগ্র চুক্তিবামাটা উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে।

## শোকের বছর

নবুয়তের দশম বছরে আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন। এর তিনদিন পর খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা মৃত্যুবরণ করেন।এইজন্য এ বছরকে শোকের বছর বলা হয়।

সহীহ বুখারীতে মুসাইইব রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু ত্বালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নাবী কারীম (সাঃ) তাঁর নিকটে আগমন করেন। সেখানে আবূ জাহলও উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন 'চাচাজান! আপনি শুধু একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি বিচার দিবসে প্রমাণ হিসেবে তা আল্লাহর সমীপে পেশ করতে পারি।"

আবু জাহল এবং আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়া বলল, আবূ ত্বালিব আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত বিমুখ হয়েই যাবেন? তারপর এরা উভয়েই অবিরাম তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। সব শেষে আবূ ত্বালিব যে কথাটি বলেছিলেন তা হচ্ছে, 'আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর।' নাবী কারীম (স) বললেন, 'আমি যতক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত না হব ততক্ষণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।'

এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ

'নাবী ও মু'মিনদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে তারা আত্মীয়- স্বজন হলেও, যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।
' (আত্-তাওবাহ ৯ : ১১৩)

আরো অবতীর্ণ হয় :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

তুমি যাকে ভালবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না।'
(আল-ক্বাসাস ২৮: ৫৬)

যখন মক্কাবাসীগণের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হতে লাগল, তখন মহানবী (সাঃ) এই বৎসরেই অর্থাৎ নবুওয়তের দশম বৎসর শাওয়াল মাসের শেষের দিকে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে তায়েফ গমন করলেন এবং তায়েফ বাসীকে সত্য কালেমার প্রতি আহহ্বান করলেন। একমাস পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে তাদেরকে তাবলীগ ও হেদায়াতের কথা জানালেন। কিন্তু একটি লোকেরও সত্য গ্রহণের তাওফিক হল না; বরং যালেমরা মহানবী (সাঃ) কে নানাভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্য আপন শহরের লোকগুলোকে লেলিয়ে দিল।

এই নিষ্ঠুর হতভাগারা সওয়ারে কায়েনাতের পিছনে লেগে গেল। রাহমাতুল্লীল আলামীনের শান যদি বাধা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে তার পবিত্র ঠোঁটের নড়াচড়ায় তাদের সকল পাগলামীর পরিসমাপ্তি ঘটে যেতে পারত এবং তায়েফ ও তায়েফবাসীর নাম নিশানা পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠ থেকে মিটিয়ে দেয়া হত। শুরু করল, যার ফলে তার পা মোবারক রক্তেরঞ্জিত হয়ে গেল। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) যে দিকে থেকে পাথর আসতে দেখতেন সেদিকে নিজে দাড়িয়ে মহানবী (সাঃ) কে বাঁচাতেন এবং নিক্ষিপ্তপাথর নিজের মাথা পেতে নিতেন। এমনকি  যায়েদের মাথা যখম হয়ে গেল।
পরিশেষে রহমতে এই হতভাগ্য দুরাচারিরা মহানবী (সাঃ) এর উপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল,মহানবি (সাঃ) একমাস পরে তায়েফ থেকে এমন অবস্থায় ফিরলেন যে,

তাঁর টাখনু ছিল রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  এর জবান মোবারক থেকে কোন বদ দো'আ আসেনি।

## মহানবী (সাঃ) এর ইসরা ও মে'রাজ

নবুওয়াতের একাদশ বৎসরটি ইসলামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট মর্যাদা রাখে। যাতে আম্বিয়া  সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  কে সম্মানজনক শোভাযাত্রার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। এই সম্মান যাহা সমস্ত নবীগণের জমাদততের মধ্যে শুধু।
 মহানবী (সাঃ) এর পৃথক বৈশিষ্ট্য ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

একরাতে মহানবী (সাঃ) হাতীমে কা'বায় শায়িত ছিলেন।এমতাবস্থায় হযরত জিবারাইল (আঃ) আগমন করলেন এবং বলিলেন- "আমার সাথে চলুন।" তাকে বোরাকে সওয়ার করানো হল। যার দ্রুত গতি এত ছিল যে, যেখানে তার দৃষ্টি পড়ত, সেখানেই তার কদম পড়ত। এমনি তড়িৎ গতিতে মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রথমতঃ সিরিয়ায় (শাম) আল-মসজিদে নিয়ে যাওয়া হল।
সেখানে আল্লাহ তাআলা সমস্ত পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম কে মহানবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ) এর সম্মানার্থে (মো'জেযা স্বরূপ) একত্রিত করে রেখেছিলেন। জিব্রাইল (আঃ) সেখানে পৌঁছে আযান দিলেন এবং সমস্ত নবী ও রাসূলগণ নামাযের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন। কিন্তু নামাযের ইমামতি কে করবেন এমর্মে সকলেই অপেক্ষা করছিলেন। জিব্রাঈল আমীন নবীজির হস্ত মোবারক ধরে তাঁকে সামনে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি সমস্ত নবী-রাসূল ও ফেরেস্তাগণকে নামায পড়ালেন। এই পর্যন্ত পার্থিব জগতের সফর ছিল, যা বোরাকের মাধ্যমে হয়েছিল।

তারপর ধারাবাহিকভাবে আকাশ সমূহের সফর করানো হল। প্রথম আকাশে হযরত আদম (আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল। দ্বিতীয় আকাশে হযরত ঈসা ও ইয়াহইয়া (আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল। তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল। চতুর্থ আকাশে হযরত ইদ্রীস (আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল। পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন (আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল। ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা

(আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল। সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে মোলাকাত হল।

(ফতহুল বারী ১৫ পারা, পৃষ্ঠা ৪৮৫)

এরপর মহানবী (সাঃ) সিদরাতুল মুনতাহার দিকে তাশরীফ নিয়ে যেতে লাগিলেন। রাস্তায় হাউযে কাওছার অতিক্রম করলেন। অতপর তিনি জান্নাতে প্রবেশ করলেন। সেখানে আল্লাহর কুদরতী হাতের ঐসব বিস্ময়কর জিনিষ ও অপূর্ব সৃষ্টি সমূহ দর্শন করলেন, যা আজও কেউ দর্শন করেনি কোন কানও তা শুনেনি এবং কোন মানুষের চিন্তাধারাও সেখান পর্যন্ত পৌঁছেনি।

অতঃপর দোযখকে তার সামনে হাযির করা হল। অতঃপর কতগুলো লোক দেখলাম। তাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মত এবং তাদের হাতের মুঠোয় দগদগে জ্বলন্ত ছোট ছোট পাথর টুকরা রয়েছে। সেগুলো তারা মুখে পুরছে। আর পরক্ষণেই তা মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে জিবরীল, এরা কারা?' তিনি বললেন, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতকারী 'এরা এরপর আরো কিছু সংখ্যক লোক দেখলাম। তাদের পেটের মত বীভৎস আকৃতির পেট আর কিখনো দেখিনি। দেখলাম, ফেরাউনের সহযোগীদের যে পথ দিয়ে দোযখে নেয়া হচ্ছে, সেই পথের ওপর তারা অবস্থান করছে। (ফিরাউনের সহযোগীদের জাহান্নামের কঠিনতম শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে)

তারা পিপাসা-কাতর উটের ছটফট করছে। আর ফিরাউনের দোযখগামী অনুসারীরা তাদেরকে পায়ের তলায় মত পিষ্ট করে যাচ্ছে তথাপি সেখান থেকে একটু সরে বসবার ক্ষমতাও তাদের নেই।
আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে জিবরীল, এরা কারা?' তিনি বললেন, 'এরা সুদখোর। অতঃপর আরো একদল লোক দেখলাম। তাদের সামনে উৎকষ্টমানের পুষ্ট গোশত রয়েছে। আর তার পাশেই রয়েছে উৎকট দুর্গন্ধ যুক্ত খারাপ গোশত। অথচ তারা ভালো গোশত বাদ দিয়ে খারাপ গোশত খাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে জিবরীল, এরা করা?' তিনি বললেন, 'এরা সেই সব লোক যারা বৈধ স্ত্রী থাকতে নিষিদ্ধ স্ত্রী লোকের

কাছে যায়।'অতঃপর কিছুসংখ্যক নারীকে দেখলাম তাদের স্তনে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'হে জিবরীল, এরা কারা?' তিনি বললেন, 'এরা সেই সব নারী যারা ব্যাভিচারের মাধ্যমে অন্যের ঔরসজাত সন্তান স্বামীর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়।'

এরপর তিনি দ্বিতীয় আকাশে আরোহণ করালেন। সেখানে (দুই খালাতো ভাই ঈসা (আ) ও ইয়াহইয়া ইবনে যাকারীয়ার (আ) সাক্ষাত পেলাম। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে তৃতীয় আকাশে আরোহণ করালেন। সেখানে এক বাক্তিকে দেখলাম। তাঁর চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল। আমি বললাম, 'হে জিবরীল, 'ইনি কে?' তিনি বললেন, ইনি ইয়াকুবের (আ) পুত্র ইউসুফ (আ) অতঃপর চতুর্থ আকাশে আরোহণ করে সেখানে আর এক ব্যক্তিকে দেখলাম। জিবরাইল জানালেন ইনি ইদ্রিস (আ) অতঃপর পঞ্চম আকাশে আরোহণ করলাম। সেখানে দেখলাম, সাদা চুল ও দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী এক বৃদ্ধ অত সুন্দর বৃদ্ধলোক আমি আর কখনো দেখিনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'হে জিবরীল, ইনি কে?' তিনি বললেন, 'তিনি স্বজাতির কাছে প্রিয় হারুন ইবনে ইমরান (আ)। অতঃপর ষষ্ঠ আকাশে পৌঁছলাম। সেখানে দেখলাম বাদামী রংয়ের লম্বা নাক বিশিষ্ট এক দীর্ঘাঙ্গী পুরুষ, যেন শানুয়া গোত্রের কোন লোক। আমি বললাম, 'জিবরাইল, ইনি কে?' জিবরাইল বললেন, 'তিনি আপনার ভাই মূসা ইবনে ইমরান (আ)' অতঃপর আমাকে সপ্তম আকাশে আরোহণ করালেন। সেখানে দেখলাম, বাইতুল মামুরের দরজার কাছে একটি চেয়ারে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। তোমাদের সঙ্গী অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা) স্বয়ং তাঁর সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। বাইতুল মামুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রবেশ করে এবং তারা আর ফিরে আসে না। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিবরীল, ইনি কে?" তিনি বললেন, 'তিনি আপনার পিতা ইবরাহীম (আ)। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলেন। সেখানে ঈষৎ কালো ঠোঁট বিশিষ্ট একটি পরমা সুন্দরী যুবতীকে দেখলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কার জন্য?' সে বললো, যায়িদ ইবনে হারেসার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়িদ ইবনে হারেসাকে এই সুসংবাদটি জানিয়ে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "এরপর আমি ফিরে এলাম। আসার পথে মূসা ইবনে ইমরানের (আ) সাথে দেখা হলো। বস্তুতঃ তিনি তোমাদের একজন

উত্তম বন্ধু। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ওপর কয় ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে?" আমি বললাম, 'প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত।' মূসা বললেন, 'দেখ, নামায বড় কঠিন কাজ। তোমার উম্মাত খুবই দুর্বল। তুমি আল্লাহর কাছে ফিরে যাও এবং তোমার ও তোমার উম্মাতের জন্য দায়িত্ব আরো হালকা করে দিতে বল।' আমি আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম এবং আমার ও আমার উম্মাতের দায়িত্ব হালকা করে দিতে অনুরোধ করলাম আল্লাহ দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। অতঃপর ফিরে আসলাম। মূসার সাথে আবার দেখা হলো। তিনি আবার আগের মত বললেন। আমি আবার গিয়ে আল্লাহকে নামায কমিয়ে দেয়ার আবেদন জানালাম। আল্লাহ আরো দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি ক্রমাগত আমাকে পরামর্শ দিতে লাগলেন। যখনই তাঁর কাছে ফিরে যাই, তিনি বলেন, 'যাও, আরো কমিয়ে দিতে বলো। এভাবে কমাতে কমাতে দিনে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাকি রইলো। এবারও মূসার (আ) কাছে ফিরে এলে তিনি আরো কমিয়ে আনার পরামর্শ দিলেন। আমি বললাম, 'বহুবার আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়েছি এবং কমিয়ে দিতে বলেছি। আমি লজ্জাবোধ করছি। তাই আর ফিরে যেতে পারবো না।' অতএব যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঈমান ও সতর্কতার সাথে পড়বে, সে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সওয়াব পাবে"।

এর পর সেখানে থেকে তিনি ফিরে এলেন। পুনরায় বোরাকে চড়ে মক্কা শরীফের দিকে চলতে লাগলেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে কুরাইশদের তিনটি ব্যবসায়ী কাফেলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। যাদের মধ্য থেকে কোন কোন লোককে তিনি সালামও করেন। তারা উনার কণ্ঠস্বর বুঝতে পারলেন এবং মক্কায় ফিরে আসবার পর এ ব্যপারে সাক্ষীও দিলেন। ভোর হওয়ার পূর্বেই এই মোবারক সফর সমাপ্ত হয়ে যায়।

(ইবনে হিসাম)

# মদীনায় ইসলাম বিস্তারের সূচনা

অবশেষে সেই সময়টি এসে উপনীত হলো যখন আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করা, তাঁর নবীকে অধিকতর মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা এবং তাঁকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবারও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথারীতি হজ্জ উৎসবে আগত লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে ও তাঁকে আপন করে গ্রহণ করার জন্য আরব গোত্রগুলিকে অনুরোধ করতে লাগলেন। এবার তিনি কিছুসংখ্যক মদীনাবাসীর সাক্ষাত পেলেন। এরা ছিলেন মদীনার খাজরাজ গোত্রের একটি দল। আকাবার কাছাকাছি এক স্থানে তাদের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে।এরপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সহচর্যে বসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দাওয়াত দিলেন, ইসলাম পেশ করলেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করে শোনালেন। তিনি যখন খাজরাজ গোত্রের দলটির সাথে আলাপ আলোচনা করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিলেন তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগলো, আল্লাহর শপথ ইনি তো সেই নবী যার কথা বলে ইহুদীরা আমাদেরকে হুমকি দেয় ও শাসায়।

এভাবে তারা ঈমান আনা ও ইসলামকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার পর নিজ এলাকায় ফিরে গেলেন। যতদূর জানা যায় খাজরাজ গোত্রীয় এই দলটির সদস্য ছিল ৬ জন। মদিনায় পৌঁছে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য গোত্রের কাছে পেশ করলেন। এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। এভাবে ক্রমে মদিনার প্রতিটি ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেল। এমন একটি বাড়িও অবশিষ্ট রইল না যেখানে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কথা আলোচিত হতো না।

# আকাবার প্রথম বাইয়াত

পরবর্তী বছর আরো বারো জন মদীনাবাসী হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আসলো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আকাবায় সাক্ষাত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণ পূর্বক অনৈসলামিক

কার্যকলাপ পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার করলেন। এই অঙ্গীকার গ্রহণ অনুষ্ঠানকে আকাবার প্রথম বাইয়াত বলা হয়।

এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো মুসলিম নারীদের বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতিতে যা মক্কা বিজয়ের পরের দিন পুরুষদের বাইয়াত গ্রহণের অব্যবহিত পর সাফা পর্বতের ওপর অনুষ্ঠিত হয়। আকাবার প্রথম বাইয়াত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ আসার পূর্বে। এ বাইয়াতে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন আসআদ ইবনে যুরারা, রাফে ইবনে মালিক 'উবাদা ইবনুস ছামিত এবং আবুল হাইসাম ইবনে তাইহান। 'উবাদা ইবনুস ছামিত বলেন, "আমি আকাবার প্রথম বাইয়াতে উপস্থিত ছিলাম। আমরা ছিলাম বারো জন পুরুষ।

ইবনে ইসহাক বলেন, মদিনার এই দলটি যখন নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে মুসআব ইবনে উমাইরকে পাঠিয়ে দিলেন তাদেরকে কুরআন পড়ানো ইসলাম শিক্ষা দেওয়া ও ইসলামী বিধানের তত্ত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। তিনি মদিনার মুসলমানদেরকে নামাজও পড়তেন।

## আকাবার দ্বিতীয় শপথ

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্বের মৌসুমে (জুন, ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে) ইয়াসরিবের সত্তর জনেরও অধিক মুসলিম ফরজ হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন।
কা'ব বিন মালিক আনসারী মোল্লা বলেছেন, 'আমরা হজ্জের জন্য বের হলাম। আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিবাগত রাতে রাসূলুল্লাহ এর সঙ্গে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং আমরা হজ্জ থেকে ফারেগ হলে নির্ধারিত সময় উপস্থিত হল।

আমরা সংখ্যায় ছিলাম মোট পঁচাত্তর জন। তিহাত্তর জন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা। মহিলা দু'জনের একজন ছিলেন উম্মু 'উমার দুয়ায়বা বিনতে কা'ব। তিনি কাবিলা বন্ধু মাযিন বিন নাজ্জারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। দ্বিতীয় জন ছিলেন উৎ মানী আসমা

বিনতে 'আমর। তিনি বনু সালামাহ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। আমরা সকলে সুড়ঙ্গে একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আব্বাস রাঃ আসলেন। নবীজি প্রথমে কোরআন থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করলেন আলাদিনের দাওয়াত পেশ করলেন এবং ইসলামের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করলেন পরে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন।

## বাইয়াতের দফাসমূহ

তিনি বললেন তোমরা যে কথার উপর শপথ গ্রহণ করবে তা হচ্ছে -

১.সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় কথা শুনবে ও মেনে চলবে।

২.অভাবে ও সচ্ছলতায় একই ধারায় খরচ করবে।

৩.ভালো কাজের জন্য আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে।

৪.আল্লাহর পথে দন্ডায়মান থাকবে আল্লাহর ব্যাপারে কোন ভর্র্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করবে না।

৫.যখন আমি তোমাদের নিকট হিজরত করে যাব তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং যেমন ভাবে ও সন্তানদের হেফাজত করছে সেভাবে আমার হেফাজত করবে। এ সব করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

## মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরাত করার অনুমতি দান

আল্লাহর তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো আর মদীনাবাসীদের উপরোক্ত দলটি ইসলামী বিধানের অনুসরণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা দানের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সব মুসলমানকে মদীনায় হিজরাত করে তাদের আনসার ভাইদের কাছে চলে যাওয়ার

নির্দেশ দিলেন যারা ইতিমধ্যেই নিজ নিজ গোত্রকে ত্যাগ করে ছিন্নমূল অবস্থায় এখানে সেখানে অবস্থান করছিলেন।

## মদীনায় হিজরতকারী মুসলমানদের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মধ্যে কুরাইশ বংশীয় প্রথম মুহাজির ছিলেন বনী মাখযুম গোত্রের আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ। আকাবার বাইয়াতের এক বছর আগে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন। ইতিপূর্বে তিনি আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসেন। এই সময় কুরাইশরা তাঁকে উৎপীড়ন করতে লাগলো। তিনি মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনতে পেলেন এবং তাঁর সাথে হিজরাত করে চলে গেলেন। আবু সালামার পর আমের ইবনে রাবীয়া এবং মদীনায় তাঁর স্ত্রী লায়লা বিনতে আবু হাসমা মদীনায় হিজরাত করেন। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ তাঁর পরিবার পরিজন ও ভাই আবদ ইবনে জাহাশকে সাথে নিয়ে হিজরাত করেন। তাঁর ভাইয়ের আর এক নাম ছিলো আবু আহমাদ। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিলো ক্ষীণ। তা সত্ত্বেও তিনি কারো সাহায্য ছাড়াই মক্কার উচ্চ ও সমতল এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন। তিনি ছিলেন একজন কবি। এরপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ও আইয়াশ ইবনে আবু রাবিয়া মাখযুমী হিজরাত করে মদীনায় চলে যান। অতঃপর ব্যাপকহারে মুসলমানগণ মদীনায় হিজরাত করতে থাকেন।

## মহানবী (সাঃ) এর মদীনায় হিজরত

কুরাইশরা যখন ব্যাপরটি জানতে পারল, তখন তারা মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উদ্দেশ্য দারুন নদওয়াতে একত্রিত হল। কেউ কেউ তাকে বন্দী করে রাখার পরামর্শ দিল। আবার কেউ কেউ তাকে দেশত্যাগ করার পরামর্শ দিল। কিন্তু তাদের মধ্যে চতুর লোকেরা বলল, এগুলির একটাও করা ঠিক হবে না। কেননা বন্দী করা হলে তাঁর সমর্থক ও আনসারগণ আমাদের উপর চড়াও হবে এবং তাঁকে ছাড়িয়ে

নিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তাকে দেশত্যাগী করলে তা হবে আরও ক্ষতিকারক। কারণ, এমতাবস্থায় মক্কার আশ পাশের লোকেরা তার ভদ্রতা সূলভ চরিত মাধূর্য, মিষ্টকথা ও পবিত্র কালামের গুণগ্রাহী হয়ে উঠবে এবং তিনি এ সকল লোককে নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করবেন।

(সীরাতে মোগলতাঈ)

এজন্য হতভাগা আবু জাহেল প্রস্তাব করল যে, তাঁকে হত্য করা হউক এবং হত্যায় প্রত্যেক গোত্র হতে এক এক জন করে অংশ গ্রহণ করুক, যেন বনি আবদে মানাফ (মহানবী (সাঃ) এর কবিলা) প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।

বৈঠকের সকলেই আবু জাহেলের অভিমত পছন্দ করল এবং তাদেরকে বলে দেওয়া হল যে অমুক রাত্রে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এদিকে আল্লাহ তাআলা মহানবী (সাঃ) কে কুরাইশদের সকল ষড়যন্ত্র জানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে সত্বর হিজরতের হুকুম প্রদান করলেন।

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে হিজরতের অনুমতি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ আবু বকরকে বিষয়টি জানানোর জন্য তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হলেন। আ'ইশাহ সেদিনের কথা বর্ণনা করেন, 'আমরা দেখলাম একজন মানুষ মুখ কাপড়ে ঢেকে আমাদের বাড়ির দিকে আসছেন।' আবু বকর তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে তিনি আল্লাহর রাসূল। আবু বকর বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার, তা না হলে তিনি এ অসময়ে এভাবে আসতেন না।

দুপুর বেলা বিশ্রামের সময়ে রাসূলুল্লাহর এভাবে আসার কথা না। রাসূলুল্লাহ ঘরে ঢুকেই আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পরিবারের  সবাই কি চলে গেছে?'
আবু বকর বললেন, 'এখানে যারা আছেন তাঁরা তো সবাই আপনার পরিবারের সদস্য।'
আবু বকর বুঝাতে চাইলেন, আমার পরিবার তো আপনার নিজের পরিবারের মতোই, তাই আপনি তাদের বিশ্বাস করতে পারেন এবং তাদের সামনেই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে পারেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে * জানালেন, 'আবু বকর, আল্লাহ তাআলা আমাকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন।' আবু বকর বললেন, 'আল্লাহর রসূল, আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি?' রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই!' রাসূলুল্লাহর সাথে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে আবু বকর কাঁদতে লাগলেন। আ'ইশা বলেছেন, 'সেদিন আমার পিতা খুশিতে যেভাবে কেঁদেছিলেন আমি কোনোদিন কাউকে আনন্দে এভাবে কাঁদতে দেখিনি।

মদীনায় হিজরত করা যে খুব আনন্দদায়ক ভ্রমণ ছিল তা কিন্তু নয়। আবু বকর ভালোমতোই জানতেন যে, হিজরতে রাসূলুল্লাহর সফরসঙ্গী হওয়ার অর্থ নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া। তিনি বিপদাপন্ন একটি সফরে যাচ্ছেন জেনেও তিনি খুশিতে কেঁদে উঠেছিলেন শুধু এই কারণে যে, তিনি আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসতেন। নিজের জীবনের ভয়ে আবু বকর ভীত ছিলেন না, বরং রাসূলুল্লাহর জন্য এই আত্মত্যাগের সুযোগ পেয়ে তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলেন।

## রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঘরে

রাসূলুল্লাহ জানতেন তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করছেন কুরাইশরা। সেই রাতে আলী ইবন আবু তালিবকে রাসূলুল্লাহ তাঁর কাছে রাখা কুরাইশদের আমানত বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তুমি আমার এই সবুজ হাদরামাউতি চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে থাকো। ওদের হাতে তোমার কিছুই হবে না।' আলী নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূলুল্লাহর কথামতো বিছানায় শুয়ে থাকলেন। সাহাবারা আগ্রহের সাথে তাদের এই দায়িত্বগুলো পালন করতেন। এমনকি নিজেদের জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছেন খুশিমনে।

এদিকে কুরাইশরা ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশায়। আবু জাহেল তার সঙ্গীদের বললো, 'আরে তোমরা জানো মুহাম্মাদ কী বলে। সে বলে তার দ্বীন মানলে তোমরা নাকি আরব অনারবের বাদশাহ হবে! মরার পর তোমাদের নাকি বাগান থাকবে, জর্ডানের বাগানের মতো বাগান। আর তোমরা যদি তাকে না মানো, তাহলে তোমাদের

মেরে ফেলা বৈধ হয়ে যাবে আর মরার পর তোমরা আগুনে পুড়বে।' 'হ্যাঁ, আমি এ কথাই বলেছি আর আগুনেই পুড়বে তুমি' রাসূলুল্লাহ হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন রাসূলুল্লাহ, কেউ তাঁকে আর দেখতে পেল না। সকলের অগোচরে তিনি ঘর ত্যাগ করলেন। রাসূলুল্লাহ তখন আবৃত্তি করছিলেন সূরা ইয়াসীনের আয়াত, 'আমি ওদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি এবং আবৃত করে দিয়েছি, ফলে ওরা দেখতে পায় না।"

(সূরা ইয়াসিন, ৩৬: ৯)

এদিকে কুরাইশদের সেই এগারো জন মাথায় মাটি নিয়ে বসে থাকলো নির্ধারিত সময়ের আশায়।
কিন্তু তারা তার আগেই জানতে পারলো আল্লাহর রাসূল আগেই বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। তবু দুরাশা নিয়ে রাসূলুল্লাহর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো কেউ একজন বিছানায় শুয়ে আছে। তারা ভাবলো বুঝি রাসূলুল্লাহ শুয়ে আছে। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা দেখলো শুয়ে আছে আলী। প্রচণ্ড হতাশ হয়ে আলীকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় মুহাম্মাদ?' আলী বললেন, 'জানি নাহ।'

(সীরাত ইবন হিশাম)

## পাহাড়ের গুহায় অবস্থান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুর পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। এদিকে কুরাইশ যুবকরা সকাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসার অপেক্ষা করিতে লাগল। অবশেষে তারা যখন টের পাইল যে, মোহাম্মদের বিছানায় হযরত আলী শুইয়া আছেন, তখন তাহারা বিস্ময়ে বিমুঢ়

হইয়া চতুর্দিকে তাঁহার সন্ধানে চর পাঠাইল এবং মোহাম্মদ (সাঃ) কে যে বন্দী করিতে পারিবে তাহাকে একশত উট পুরস্কার দানের ঘোষণা দেওয়া হইল।

অসংখ্য মানুষ তাঁহার সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। মক্কার কোন কোন "পদচিহ্ন বিশারদ" তাঁহার পদচিহ্ন ধরিয়া খোঁজ করিতে করিতে ঐ গুহার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। আর সামান্য একটু ঝুঁকিয়া দেখিলেই তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্পষ্ট দেখিতে পাইত।

এই সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) বিচলিত হইয়া উঠিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, "ভয় পাইও না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন"।

আল্লাহর কুদরতে কাফেরদের দৃষ্টি ঐ গুহা হইতে অন্য দিকে ফিরিয়া গেল এবং গুহার প্রবেশ পথে তৎক্ষণাৎ মাকড়শা ও  জংলী কবুতর আসিয়া বাসা তৈরী করিয়া ফেলিল। সুতরাং কেহই গুহার অভ্যন্তরে ঝুঁকিয়া দেখিল না, বরং তাহাদের সবচাইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি উমাইয়া বিন খালফ গুহার মুখে মাকড়শার জাল ও কবুতরের বাসা দেখিয়া মন্তব্য করিল, এখানে তাহাদের থাকা সম্ভব নহে।

মহানবী (সাঃ) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সে গুহায় তিন রাত্রি লাগাতার আত্মগোপন করে রইলেন।

পরিশেষে তালাশকারীরা নিরাশ হয়ে ফিরে যান। ঐ তিন দিন রাতের অন্ধকারে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর ছেলে আবদুল্লাহ গোপনে মহানবী (সাঃ) এর কাছে আসতেন এবং প্রভাত হওয়ার আগেই মক্কায় চলে যেতেন। সারাদিন কুরাইশদের খবরা খবর সংগ্রহ করে রাত্রি বেলায় তার নিকট এসে বর্ণনা করতেন। আবদুল্লাহর বোন হযরত আছমা (রাঃ) বিন্ত আবি বকর সিদ্দীক (রাঃ) প্রত্যেক রাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে খানা পৌছাতেন। আরবরা যেহেতু ছিল পদ চিহ্ন বিশারদ, সেহেতু আব্দুলাহ তার গোলামকে প্রতি দিন বকরিগুলি ঐ গুহার নিকটে চড়াতে আদেশ দিয়েছিলেন যাতে তাঁর পদ চিহ্নগুলি মুছে যায়।

## গারে সওর থেকে মদীনা যাত্রা

সাওর পর্বতের গুহায় অবস্থানের তৃতীয় দিন ৪ঠা রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাঃ) এর আযাদকৃত গোলাম আমের ইবনে ফুহাইর (রঃ) সেই উট দুটি নিয়ে উপস্থিত হলেন, যেগুলি এই সফরের জন্যই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) তৈরী করে রেখেছিলেন। তার সাথে আবদুল্লাহ ইবনে ওরায়কীত (রাঃ) ও এলেন যাকে তিনি পথ প্রদর্শক হিসাবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সঙ্গে নিয়েছিলেন মহানবী (সাঃ) একটি উটের উপর সওয়ার হলেন এবং আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) অন্যটির উপর। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) খেদমতের জন্য আমের ইবনে ফুহাইরকেও সাথে নিয়ে নিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়কীতও পথ দেখানোর জন্য আগে আগে চললো।

(সিরাতে হাকাবিয়া)

## কুবায় উপস্থিতি

আবদুর রহমান ইবনে উয়াইমির ইবনে সায়েদা স্বগোত্রীয় বিপুল সংখ্যক সাহাবীর এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন: আমরা যখন শুনতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে রওয়ানা হয়েছেন এবং যে কোন দিন মদীনায় পৌছতে পারেন বলে আমরা মনে করছিলাম, তখন থেকে প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর আমাদের এলাকার উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতীক্ষা করতাম।

সূর্যের উত্তাপ অসহনীয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা সরতাম না। যখন আর কোন ছায়া থাকতো না তখন ফিরে যেতাম। তখন ছিলো প্রচণ্ড গরমের মৌসুম। যে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যি সত্যি এসে পৌঁছলেন, প্রতিদিনের মত সেদিনও আমরা প্রান্তরে বসে অপেক্ষা করছিলাম।

একজন ইহুদী সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিলো। আমরা কিভাবে তাঁর অপেক্ষায় থাকতাম তা সে দেখেছিলো। তাই সে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললো, "হে কায়লার বংশধরগণ, তোমাদের সৌভাগ্যের ধন এসে গিয়েছে।" আমরা একটা খেজুর গাছের ছায়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলাম।

ইবনে ইসহাক বলেন, অনেকের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম কুলসুম ইবনে হিদামের, আবার কারো কারো মতে সা'দ ইবনে খাইসামার মেহমান হন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবাতে বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রে সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার এই চার দিন অবস্থান করেন। এই সময় তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

(সীরাতে ইবনে হিশাম)

## মদীনায় প্রবেশ

মহানবী (সাঃ) কুবা থেকে বিদায় গ্রহণ করে রবিউল আওয়াল মাসের শুক্রবার দিন মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। মদীনার আনসারগণ আনন্দের জোশে মহানবী (সাঃ) এর সাওয়ারীর চারদিকে চলতে লাগলেন। কেউ কেউ পায়ে হেঁটে আবার কেউ কেউ সাওয়ার হয়ে পথ চলছিলেন। মহানবী (সাঃ) এর উটনীর লাগাম ধরে সম্মুখ দিকে টানবার জন্য সকলের সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে ছিলেন। সকলের মনের বাসনা তাই ছিল যে, মহানবী (সাঃ) তার বাড়ীতে অবস্থান করুক। মহিলা ও শিশু-কিশোরগণ খুশির বাক্য গাচ্ছিল। সেই দিনটি ছিল শুক্রবার। বনি সালেম নিকট জুমাআর নামায আদায় করতঃ পুণরায় সওয়ার হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে যে আনসারী সাহাবীর বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনিই মহানবী (সাঃ) কে তার বাড়ীতে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন।

কিন্তু নবীজি বলতে ছিলেন, তোমরা উটনীটিকে নিজের গতির উপর ছেড়ে দাও, কেননা, সে আল্লাহর হুকুমের উপর আদিষ্ট। যে জায়গায় অবস্থানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একে হুকুম করা হবে সে স্থানে গিয়ে সে নিজেই থেমে যাবে। সুতরাং উটনীটি এভাবেই চলতে লাগল। অবশেষে সে মহানবী (সাঃ) এর মামার বংশ বনী আদী ইবনে নাজ্জারের এলাকায় হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এর বাড়ীর সামনে গিয়ে বসে পড়ল। মহানবী (সাঃ) আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এর মেহমান হয়ে গেলেন। এবং বেশ কিছু দিন যাবৎ তার ঘরেই অবস্থান করলেন।

## মাসজিদুন নাববী নির্মাণ

মদীনায় আগমনের পর রাসূল সর্বপ্রথম মাসজিদ নির্মাণ করেন। এর আগে যেখানেই সুযোগ হতো সেখানেই নামাজ আদায় করা হতো। হিজরতের সময় রাসূল এর উটটি যে জায়গায় এসে বসে ছিলো, সে জায়গাতে মাসজিদ নির্মাণ করা হয়। জায়গাটি ছিলো দু'জন অনাথ বালকের। তাদেরকে ন্যায্য মূল্য দিয়ে জায়গাটি কিনে নেওয়া হয়।
রাসূল স্বয়ং নির্মাণ কাজে অংশ নেন।

তিনি ইট ও পাথর বহন করছিলেন আর বলছিলেন-

-اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة " فاغفر للأنصار والمهاجرة"

হে আল্লাহ! জীবন তো কেবল পরকালের জীবন। তাই আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দিন।"

# আযান ব্যবস্থা

হিজরতের প্রথম দিকেই আযান ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রব্বিহী (রাযি). স্বপ্নের মাধ্যমে আযানের শব্দগুলো শুনেন। অতঃপর তিনি তা রাসূল ﷺ এর কাছে পেশ করেন। তাছাড়া উমর (রাযি).ও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন। আর তা রাসূল এর কাছে পেশ করেন। তারপর সে অনুযায়ী আযান ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

(উসওয়াতুন হাসানাহ)

**যুদ্ধের অনুমতি**

এ ভয়ভীতি ও বিপজ্জনক অবস্থা মদীনায় মুসলিমদের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ দেখা দেয়। তাদের নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, কুরাইশরা কোনো মতেই তাদের বিদ্বেষপরায়ণতা ছাড়বে না। অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের উপর যুদ্ধ
ফরয করা হয়নি।
আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন-

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো।

(সূরা আনফাল, ৮:৪৩)

কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।"
সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযি. এর বর্নণা মতে , দ্বিতীয় হিজরী সনে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর যুদ্ধ ফরয করে দেন এবং এ সম্পর্কিত কয়েকটি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেন।

)وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" ( ۝

তোমরা আল্লাহর পথে সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদের কে ভালোবাসেন না।

(. সহীহ বুখারী: ১/৪০৪, সহীহ মুসলিম: ২/২৮০)

## বদরের যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সঠিক সংখ্যা ছিল ৯৫০ জন। রাসূলুল্লাহর হিসাব প্রায় ঠিক ছিল। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৩০০ জনের একটু বেশি, অর্থাৎ মুসলিমরা ছিল কুরাইশদের ৩ ভাগের ১ ভাগ। তাদের মধ্যে ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির, ৬১ জন ছিলেন আল আওস গোত্রের আর ১৭০ জন ছিলেন আল খাযরাজের। আল আউস গোত্রের বাসস্থান ছিল মদীনার উপরিভাগে। আর রাসূলুল্লাহ সেনা সংগ্রহ করার সময় বলেছিলেন, যাদের বাহন প্রস্তুত আছে শুধু তাঁরা সেনাদলে যোগদান করতে পারবে।

রণক্ষেত্রে অবস্থান যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর রাসূল দাঁড়িয়ে। তিনি ভাবছেন কোন অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করলে কৌশলগত সুবিধা হবে। তিনি ভেবেচিন্তে একটি অবস্থান নির্বাচন করলেন। তখন একজন আনসারী সাহাবি, আল হাব্বাব ইবন আল মুনযির রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ কি আপনাকে ওয়াহীর মাধ্যমে এই জায়গা নির্ধারণ করতে আদেশ দিয়েছেন নাকি আপনি কৌশলগত কারণে জায়গাটি পছন্দ করেছেন?

আল হাব্বাবের প্রশ্নের ধরনটি লক্ষণীয়। তিনি জানতে চাইছেন সেই নির্দিষ্ট জায়গাটি পছন্দ করার কারণ কী। যদি এটি আল্লাহর তরফ থেকে ওয়াহী হয়, তাহলে আল হাব্বাব তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন, কিন্তু যদি যুদ্ধের কোনো কৌশল হয় তাহলে তাঁর কিছু বলার আছে। রাসূলুল্লাহ তাঁকে বললেন, 'না, এটা ওয়াহী নয়, এটা নিছক যুদ্ধের কৌশল। আল মুনযির তখন প্রস্তাব করলেন যে, তাদের উচিত বদরের কুয়া পর্যন্ত পৌঁছানো এবং কুয়াকে পেছনে রেখে একটি জলাধার তৈরি করে কুয়ার সামনে অবস্থান

নেওয়া। তিনি এর পেছনে যুক্তিও দেখালেন। মুসলিমরা যদি এই অবস্থানে থাকে তাহলে কুরাইশরা পানির নাগাল পাবে না কিন্তু মুসলিমদের দখলে প্রচুর পানি থাকবে। রাসূলুল্লাহ তাঁর এই প্রস্তাব খুবই পছন্দ করলেন এবং সে অনুযায়ী যুদ্ধের অবস্থান বেছে নিলেন।

( সী রা হ)

## আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের বৃষ্টিপাত

যুদ্ধের আগের রাতে রাসূলুল্লাহ একটি স্বপ্ন দেখলেন। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আল্লাহ তাদের মনে স্বপ্নের মাধ্যমে শক্তি যোগান। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ দেখলেন যে বাস্তব সংখ্যার চেয়ে কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যের সংখ্যা খুবই কম। কেন আল্লাহ আযযা ওয়াজাল, রাসূলুল্লাহ কে কুরাইশ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার চেয়ে কম দেখালেন?

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল চেয়েছিলেন মু'মিনদের অন্তর দৃঢ় রাখতে। কুরাইশ বাহিনী ছিল মুসলিম বাহিনীর তিনগুণ। এটা মুসলিমদের মনোবল দুর্বল হওয়ার কারণ হতে পারে। যদি কোনো সৈন্য এটা ভেবে যুদ্ধের ময়দানে যায় যে, তাদের জেতার কোনো সম্ভাবনাই নেই, ভাহলে সে যুদ্ধের ময়দানে ভেঙে পড়বে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে দেখান যেন মুসলিমরা হতোদ্যম হয়ে না পড়ে। "আর সস্মরণ করো, যখন আল্লাহ স্বপ্নে আপনাকে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন বেশি করে দেখালে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং এ বিষয় নিয়ে তোমরা একে অপরের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিতে- কিন্তু আল্লাহ (এটা হতে না দিয়ে) তোমাদের রক্ষা করেছেন। মানুষের অন্তরে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে, তা তিনি জানেন।"

# লড়াইয়ের সূচনা

যখন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখী হলো, তখন রাসূল আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন। এরপর তিনি সাহাবাদের কাতার ঠিক করে দিলেন। ফলে তাঁরা সুদৃঢ় প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেন। আসওয়াদ ইবনে আব্দুল আসাদ মাখযূমী যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে এসে বলতে লাগলো, আমি এদের (মুসলিম বাহিনীর) হাউযের পানি পান করবো অথবা তা ভেঙে ফেলবো, আর না হয় এর জন্য জীবন দিয়ে দেবো। হামযা রাযি. হাউযের পাড়ে তরবারির দ্বারাই এ নরাধমের আত্মঅহমিকার ফল দেখিয়ে দিলেন। এটাই ছিলো বদরের প্রথম হত্যা।

এদিকে কুরাইশদের পক্ষ থেকে উতবাহ, শায়বাহ ও তাদের পিতা ওয়ালীদ এগিয়ে এলো। আর চিৎকার করে বলছিলো, কে আসবি আয়, আমাদের তরবারির খেলা দেখে যাও। মুসলিমদের পক্ষ থেকে তিনজন আনসারী সাহাবী এগিয়ে আসলে এ মুশরিকরা তাদের সাথে নয় বরং মক্কার মুসলিমদের সাথে লড়াই করার দম্ভ প্রকাশ করলো। তারা বললো, হে মুহাম্মাদ! মদীনার এ কৃ যকদের সাথে লড়াই করা আমাদের জন্য সম্মানজনক নয়। আমাদের জন্য যোগ্য যোদ্ধা পাঠাও। রাসূল এ তিন আনসারী সাহাবীকে ফিরে আসতে বললেন এবং নিজের পরম আত্মীয়দের মধ্য থেকে হামযা রাযি.. আলী রাযি. ও উবাইদা ইবনে হারিস রাযি. কে এগিয়ে যেতে বললেন।

আলী (রাযি.) ওয়ালীদকে এবং হামযা ( রাযি.) শায়বাহকে হত্যা করলেন। আর উবাইদা (রাযি.) ছিলেন সবার চাইতে বৃদ্ধ। তিনি ও উতবা পরস্পরকে মারাত্মক জখম করেন। পরে হামযা রাযি. ও আলী রাযি. এগিয়ে এসে শায়বাহ ও ওয়ালীদের মতো তাকেও ধরাশায়ী করে ফেলেন।

## সাহাবায়ে কেরামদের আত্মোত্যাগ

যখন উভয় বাহিনীর পরস্পর লড়াই শুরু হলো, দেখা গেলো নিজেদের অনেক স্নেহভাজন কলিজার টুকরা তরবারির নিচে এসে পড়েছে। তবুও সাহাবায়ে কেরাম কোনো কিছুর পরোয়া করেননি। না কোনো ভয়কে তাঁরা পরোয়া করেছেন। আর না কোনো স্নেহ-বন্ধনকে তাঁরা প্রশ্রয় দিয়েছেন। আবু বকর রাযি. এর ছেলে ময়দানে আসলে স্বয়ং আবু বকর রাযি. তাঁর তরবারিকে উত্থিত করেন। উতবা সামনে আসলে তার ছেলে আবু হুযাইফা রাযি. তরবারি নিয়ে এগিয়ে গেলেন। উমর রাযি. এর মামা ময়দানে এলে ফারুকী তলোয়ার তার উপযুক্ত ফায়সালা করে দেয়।

আবু বকর রাযি. এর ছেলে ময়দানে আসলে স্বয়ং আবু বকর রাযি. তাঁর তরবারিকে উত্থিত করেন। উতবা সামনে আসলে তার ছেলে আবু হুযাইফা রাযি. তরবারি নিয়ে এগিয়ে গেলেন। উমর রাযি. এর মামা ময়দানে এলে ফারুকী তলোয়ার তার উপযুক্ত ফায়সালা করে দেয়।

## আবু জাহেলের পতন

আবু জাহেলের ইসলাম বিদ্বেষ ও তার দুষ্কর্ম সর্বজনবিদিত ছিলো। আনসারদের মধ্য থেকে দু'জন বীরকেশরী সিংহ শাবক মুআয ও মুআওয়াজ। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আবু জাহেলকে দেখামাত্র তাকে তাঁরা হত্যা করবেন আর না হয় নিজেরা শহীদ হয়ে যাবেন। তাঁরা আবু জাহেলকে চিনতেন না। তাই আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. নিকট এ নরাধমের পরিচয় জানতে চাইলেন। আব্দুর রহমান রাযি. এতক্ষণ চিন্তা করছিলেন, যদি শক্তিশালী সঙ্গী পাওয়া যেতো; তবে তাঁদের সাথে মিলে আবু জাহেলকে হত্যা করা যেতো।

কিন্তু তাঁর সাথে দু'জন কিশোরকে দেখে তিনি আর অগ্রসর হলেন না। এখন দেখি তাঁরাই আবু জাহেলকে চিনতে চাচ্ছে। যাই হোক, আব্দুর রহমান রাযি. তাঁদেরকে দেখিয়ে দিলেন, এ লোক আবু জাহেল। পরক্ষণেই তাঁরা দু'জন আবু জাহেলের উপর বাজ পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেখতে দেখতে আবু জাহেলকে তাঁরা ধরাশায়ী

করে ফেললেন। এদিকে আবু জাহেলের পুত্র ইকরিমা মুআয ইবনে আমর ইবনে জামুহ রাযি. কে আঘাত করলে তাঁর হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর এ হাত নিয়ে যুদ্ধ করতে তাঁর অসুবিধা হচ্ছিলো। তাই নিজ পায়ের নিচে চাপা দিয়ে তিনি নিজের এ ঝুলে থাকা হাতটিকে একেবারে আলাদা করে ফেলেন।

আর পুরোদমে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে রাসূল কোনো একজনকে আবু জাহেলের অবস্থা দেখে আসতে বললেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. গিয়ে তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় পান। তিনি তার মস্তক কেটে এনে রাসূলের পদতলে পেশ করেন। বদর প্রান্তরে আবু জাহেলের ভোজন উৎসব আর সমস্ত দম্ভ-দাপট ধুলায় মিশে গেলো।

(. সীরাতে ইবনে হিশাম ও ইসতিয়াব আব্দুল বার , সহীহ বুখারী: ১/৪৪৪, ২/৫৬৮; মিশকাত: ২/৩৫২ ১৬২ উসওয়াতুন হাসানাহ)

## যুদ্ধে ঘটিত মোজেযাসমূহ

যুদ্ধের চরম মুহূর্তে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে এক মুঠো কঙ্কর শত্রুবাহিনীর উপর নিক্ষেপ করেন। এরপর তিনি সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেন আর তাঁরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সাহায্যার্থে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। এছাড়া আরও বহুভাবে মুসলিম বাহিনী মহান রবের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হোন। যেমন, উক্কাশাহ ইবনে মিহসানের তরবারি ভেঙে গেলে তিনি রাসূল এর কাছে আসলেন। রাসূল তাঁকে একটি কাঠের টুকরো দিলেন। তিনি হাতে নিয়ে নাড়ানো মাত্রই তা তরবারিতে পরিণত হয়ে যায়। এছাড়াও রাসূল সকালে যখন মুসলিমদেরকে দাঁড়ানোর জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, এখানে অমুকের লাশ পড়বে আর এখানে অমুকের। রাসূল যেভাবে বলেছেন, পরে সেসব স্থানে তাদের লাশ সেভাবেই পড়ে ছিলো।

## যুদ্ধের ফলাফল

যুদ্ধে কুরাইশদের বড় বড় নেতা নিহত হলে তাদের মনোবল ভেঙে যায়; ফলে তারা দিশেহারা হয়ে পলায়ন করতে থাকে। মুসলিমগণ কুরাইশ কাফেরদের ধাওয়া করেন। তাদের কাউকে হত্যা করেন আর কাউকে বন্দী করেন। যুদ্ধে কাফেরদের ৭০ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। অপরপক্ষে মুসলমানদের মাঝে ১৪ জন শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

(উসওয়াতুন হাসানাহ)

## উহুদের যুদ্ধ (শাওয়াল, ৩য় হিজরি)

কুরাইশদের শরীরে এখন দুটি অপমানের দগদগে ঘা। বদরের সামরিক পরাজয়, আর কারদাহ'র অর্থনৈতিক ধ্বস। এখন সময় এসেছে আরেকটি যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমদের ওপর সমস্ত আক্রোশ ঢেলে দেওয়ার। রীতিমতো বিপজ্জনক গতিতে চলতে থাকে এর প্রস্তুতি। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ক্রোধ আছে, এমন প্রত্যেকেই বাহিনীতে নিয়োগ পেতে থাকে। বিশেষত বদরে যারা বাপ-ভাই-সন্তান হারিয়েছে তারা।

[৩০২] বুখারি, ৪০৩৭। [৩০৩] ইবনু হিশাম, /৫০-৫১।

দম্ভভরে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে রক্তপিপাসু ভয়ানক এই মাক্কি বাহিনী। হিজরি ৩য় সনের ৬ই শাওয়াল শুক্রবারে এসে পৌঁছায় শহরের প্রান্তভাগে। আইনাইন ও উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে 'কানাহ' উপত্যকায় শিবির গাড়ে তারা। এক সপ্তাহ আগ থেকেই শত্রুর অপেক্ষায় ছিলেন নবিজি । মদীনার চারপাশে প্রহরার ব্যবস্থা করে নিশ্চিত করছিলেন শহরের নিরাপত্তা। জারি রেখেছেন জরুরি অবস্থা। মাক্কি সেনাদল এসে পৌঁছালে সাহাবিদের সাথে পরামর্শসভা করেন নিরাপত্তা জোরদারের বিষয়ে। পরিকল্পনা ছিল শহরের ভেতরে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করা। পুরুষরা সব প্রবেশপথ

ও গলিতে শত্রুর মোকাবিলা করবে। আর নারীরা বাড়ির ছাদ থেকে ইট-পাটকেল ছুড়ে তাদের সহযোগিতা করবে।

পরিকল্পনা শুনে মুনাফিক গোষ্ঠীর খুশি আর দেখে কে! ঘরেও বসে থাকা যাবে, যুদ্ধক্ষেত্রে না যাওয়ার দোষও ঘাড়ে চাপবে না। মুনাফিক-সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই জোরে সোরে সমর্থন জানালো পরিকল্পনাটির প্রতি। কয়েকজন তরুণ সাহাবি খোলাখুলি যুদ্ধের জন্য জোরাজোরি করতে থাকেন। নবি ও তাদের দাবি মেনে নিয়ে সেনাদলকে তিন ভাগে ভাগ করেন। মুহাজিরদের এক দল, আওস গোত্রের আরেক দল, আর তৃতীয়টি খাযরাজের। পতাকাবহনের দায়িত্ব পান যথাক্রমে মুসআব ইবনু উমাইর, উসাইদ ইবনু হুদাইর এবং হুবাব ইবনুল মুনযির (রদিয়াল্লাহু আনহুম)।

আসরের সালাতের পর বাহিনী নিয়ে উহুদ পাহাড়ের পথ ধরেন আল্লাহর রাসূল । 'শাইখাইন' নামক স্থানে পৌঁছে পুরো বাহিনীকে পুনঃপর্যবেক্ষণ করেন। অল্পবয়স্কদের নিরাপত্তার খাতিরে শহরে ফেরত পাঠিয়ে দেন। অবশ্য বিশেষ বিবেচনায় বাহিনীতে থাকার অনুমতি পান ঝানু তিরন্দাজ রাফি' ইবনু খাদীজ (রদিয়াল্লাহু আনহু)। সামুরা ইবনু জুন্দুব (রদিয়াল্লাহু আনহু) এসেও থাকার জন্য অনুনয় করেন।

শাইখাইনে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । সেখানেই রাত কাটান এবং পঞ্চাশ জন প্রহরীকে নিয়োগ করেন পুরো বাহিনীর দেখাশোনার জন্য। শেষরাতের নীরবতার মাঝে 'শাউত' এলাকায় আদায় করেন ফজরের সালাত। সবকিছু ভালোই চলছিল।

হঠাৎ মুনাফিকদের কাছ থেকে আসে প্রথম আঘাত। এ স্থানে এসে আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বেঁকে বসে। তিন শ সঙ্গীসহ ফিরে চলে যায় শহরে। এক হাজার জনের বাহিনী একটানে নেমে আসে সাতশ-তে। ইবনু উবাইয়ের কাজটা বানু সালামা ও বানু হারিসাকে বেশ দোটানায় ফেলে দেয়। হতচকিত ভাব কাটিয়ে ওঠার আগে তারাও ফিরে যাবার কথাই ভাবছিল। তবে নবিজি -এর নসীহত শুনে আল্লাহর রহমতে মুসলিমদের মনোবল নবায়িত হয় এবং সব রকমের দ্বিধা-সংশয় দূরীভূত হয়। অবশিষ্ট সেনাদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি রাস্তা দিয়ে নবিজি এগিয়ে চলেন উহুদের পানে। ফলে

শত্রুরা রয়ে যায় এলাকার পশ্চিম দিকে। পাহাড়কে পেছনে রেখে অবতরণ করেন উহুদ উপত্যকায়। যার ফলে এখন মুসলিম বাহিনী এবং মদীনার ঠিক মাঝখানে অবস্থান করছে শত্রুদল।

আবদুল্লাহ ইবনুে জুবাইর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর নেতৃত্বে আইনাইন পাহাড়ে পঞ্চাশ জন তিরন্দাজের এক বাহিনী নিযুক্ত করেন আল্লাহর রাসূল । এই দলটির কাজ সেখানেই অবস্থান করে পেছন থেকে আসা সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকানো। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদম কড়া নির্দেশ দিয়ে দেন যে, যুদ্ধ যেদিকেই এগোক, মুসলমানরা বিজয় লাভ করুক কিংবা কাফির-মুশরিকরা, তিরন্দাজরা যেন এ অবস্থান না নড়েন।

## দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও লড়াইয়ের শুরু

উভয় সেনাদল কাছাকাছি হলো। পৌত্তলিক পক্ষের সবচেয়ে সাহসী সেনা পতাকাবাহী তালহা ইবনু আবী তালহা আবদারি। উট হাঁকিয়ে সামনে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। জবাবে এগিয়ে আসেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রদিয়াল্লাহু আনহু)। বাঘের ন্যায় একলাফে তার উটে চড়ে বসেন এবং তাকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়েন এরপর তলোয়ার বের করে তাকে যবাই করে দেন। নবি উঁচু স্বরে বলে ওঠেন "আল্লাহু আকবার!" সকল সাহাবিও প্রতিধ্বনিত করেন সেই ধ্বনি। মূল যুদ্ধ শুরুর আগে এ-রকম দ্বন্দ্বযুদ্ধ অনেকটা আবশ্যক আনুষ্ঠানিকতা।

এর পরপরই মূল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ সে সময় মুশরিক অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান। তিন তিনবার তিনি পেছন থেকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেন। প্রতিবারই মুসলিম তিরন্দাজদের কাছ থেকে মুষলধারে ধেয়ে আসা তিরের কারণে পিছু হটতে বাধ্য হন। মুসলিম সেনাবাহিনীর আক্রমণের কেন্দ্রে থাকে পৌত্তলিক বাহিনীর এগারো জন পতাকাবাহী। একে একে সবক'টাকে খতম করতেই মুশরিকদের পতাকা ধুলোয় গড়াগড়ি করে লুটোপুটি খেতে থাকে। এরপর মূল বাহিনীতে ঢুকে পড়ে বিপুল পরিমাণ কাফিরকে কতল করেন মুসলিমরা। বিশেষত আবু দুজানা ও হামযা

(রদিয়াল্লাহ আনহুমা) সেদিন এমন বীরত্ব ও সামরিক দক্ষতা দেখান, যা গোটা ইসলামি সমর ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

তবে সেই সাথে ওই যুদ্ধেই শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেন আল্লাহর সিংহ হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু)। বদরের যুদ্ধে জুবাইর ইবনু মুত'ইমের চাচা তু'আইমা ইবনু আদিকে হত্যা করেছিলেন হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তার ছিল এক আবিসিনীয় দাস। ওয়াহশি ইবনু হারব নামক এই দাসটি। ইবনু মুত 'ইম কথা দেয় হামযাকে শহীদ করতে পারলে ওয়াহশি সে উদ্দেশ্যেই একটি পাথরের আড়ালে বর্শা নিয়ে অপেক্ষায় থাকে ওয়াহশি। ওদিকে সিবা' ইবনু উরফুতার শিরশ্ছেদ করে সোজা দাঁড়িয়ে আছেন হামযা। ঠিক এই সময় ওয়াহশি ছুড়ে মারে বর্শাটি। হামযার তলপেট ভেদ করে দুই পায়ের মাঝ দিয়ে বের হয়ে আসে তা। ফলে তিনি পড়ে যান এবং আর উঠতে পারেন না। অবশেষে শহীদ হয়ে যান আল্লাহর সিংহ হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

এত বড় ক্ষতি কাটিয়ে ওঠে ঠিকই মুসলিমরা প্রাণপণে লড়ে যান। আরও একটি পরাজয়ের স্বাদ নিয়ে পালাতে শুরু করে পৌত্তলিক সেনাদল। ধাওয়া খেয়ে মুশরিক নারীরাও এদিক-ওদিক ছুটে পালায়। আহত শত্রুদের শেষ করে দিয়ে শত্রুশিবিরের মালামাল সংগ্রহ করতে শুরু করেন মুসলিম সেনাবাহিনীর একাংশ। আপাত এই বিজয়ের পরই আস্তে আস্তে ঘটনার মোড় ঘুরতে থাকে। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কড়া নিষেধের কথা ভুলে গিয়ে তিরন্দাজদের বড় একটি অংশ নিজ অবস্থান ছেড়ে গনীমাতের মাল সংগ্রহে ছুটে আসেন। পঞ্চাশ জনের মাঝে মাত্র দশ জন দাঁড়িয়ে থাকেন ধৈর্য ধরে। কিন্তু বিপদ যা হবার, ততক্ষণে হয়ে গেছে। দুর্বল হয়ে পড়েছে মুসলিমদের প্রতিরক্ষাব্যূহ।

সুযোগ কাজে লাগাতে ভুললেন না ঝানু সমরবিদ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। নিজ বাহিনী নিয়ে অবশিষ্ট দশ তিরন্দাজকে সহজেই শেষ করে দেন। পাহাড়ের উল্টোদিক থেকে ঘুরে এসে একেবারে হতভম্ব করে দেন মুসলিমদের। চারদিক থেকে মুসলিমদের ঘেরাও করে খালিদের নেতৃত্বে হারানো ইজ্জত (!) পুনরুদ্ধারে ছুটে আসে মূর্তিপূজারির দল। নবিজির ওপর মুশরিকদের আক্রমণ ও নবিপ্রয়াণের গুজব সেনাদলের পেছনে

সাত জন আনসার ও দু'জন মুহাজিরের পাহারা-বেষ্টনীতে অবস্থান করছিলেন আল্লাহর রাসূল । সেখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পান খালিদ ও তার অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ। নবিজি তারস্বরে ডেকে ওঠেন, "আল্লাহর বান্দারা! আমার দিকে এসো!" শব্দ শুনে গলার আওয়াজ চিনে ফেলে কাছেপিঠে থাকা মুশরিকরা।

সাহায্য চলে আসার আগেই তাঁকে হত্যা করার নেশায় আওয়াজ অনুসরণ করে ছুটে আসে কিছু শত্রু। এ দৃশ্য দেখে নবি ঘোষণা দেন, "কে আছে যে তাদের আমাদের থেকে দূরে সরাবে? তার প্রাপ্য হবে জান্নাত অথবা (বলেছেন,) সে জান্নাতে আমার ঘনিষ্ঠতম সহচর হবে।" বারকয়েক এই ঘোষণা দেন তিনি। একের পর এক ছুটে আসতে থাকেন আনসাররা। আপন জীবন কুরবানি করে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রক্ষা করেন সবাই। এভাবে একে একে সাত জন আনসার শহীদ হন। ৩০৬ বুখারি, ৪০৭২; ইবনু হিশাম,/৬৭-৭২।

সপ্তম আনসারির শাহাদাতের পর নবিজির কাছে থেকে যান শুধু দুই মুহাজির তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)।

এবার নবিজি -এর দিকে মুশরিকরা পূর্ণ মনোযোগ দেয়। উড়ে আসা একটি পাথরখণ্ডের আঘাতে মাটিতে পড়ে যান নবিজি। ডান দিকের নিচের পাটির একটি দাঁত ভেঙে যায়, কেটে যায় নিচের ঠোঁট, আর শিরস্ত্রাণ ভেঙে গিয়ে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে কপাল আর মাথা।

আরেক মুশরিক তরবারির আঘাত হানে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চোখের ঠিক নিচের হাড়ে। শিরস্ত্রাণ ছিদ্র হয়ে এর দুটো রিং ঢুকে যায় রাসূলের চেহারায়। আরেকজন তাঁর কাধে এত জোরে আঘাত করে যে, পরে এক মাস পর্যন্ত প্রচণ্ড ব্যথা রয়ে যায়। তবে নবিজি গায়ে দুটি লৌহবর্ম পরিধান করেছিলেন। এই কারণে সেটা কাটতে সক্ষম হয়নি।

ওদিকে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিরক্ষায় মুশরিকদের দিকে মুহুর্মুহু তির ছুড়ছেন সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)। নিজের তূণার থেকে একটি একটি তির তার হাতে দিতে দিতে নবি বলেন, "ছুড়তে থাকো। আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক। আর তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু)

তো গোটা শত্রুদলের বিরুদ্ধে এমনভাবে লড়ছেন, যেন তিনি একাই একটি যুদ্ধবাহিনী। যুদ্ধশেষে তার শরীরে ৩৫ থেকে ৩৯টির মতো ক্ষত পাওয়া যায়। নবিজির দিকে তেড়ে আসা শত্রুদের তির- তরবারিকে হাত দিয়ে বাধা দিতে থাকেন তিনি। একসময় প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হতে হতে অবশ হয়ে আসে আঙুলগুলো।

একবার একটি তির হাতে লাগায় 'হিস' জাতীয় একধরনের শব্দ করে ওঠেন। নবি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "যদি এ জায়গায় বিসমিল্লাহ বলতে, তাহলে ফেরেশতারা তোমাকে ওপরে উঠাত এবং মানুষজন তোমাকে দেখতে পেত।" মানবপ্রচেষ্টা যখন আর পেরে উঠছিল না, আল্লাহ তাআলা তখন তাঁর নবির সুরক্ষার্থে এটি আরবি ভাষায় অন্তরঙ্গতার গভীরতা প্রকাশের একধরনের বাচনভঙ্গি।

আল্লাহ আলৌকিক সাহায্য পাঠান। জিবরাঈল এবং মিকাইল (আলাইহিমাস সালাম) নেমে এসে নবিজির হয়ে লড়াই শুরু করেন। সুযোগ পেয়ে আরও কয়েকজন সাহাবি এগিয়ে এসে জান বাজি রেখে প্রতিরক্ষায় যোগ দেন। সবার আগে আসেন আবু বকর, আর তার সাথে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)। আবু বকর দেখেন যে, নবিজির মুখমণ্ডলে শিরস্ত্রাণের রিং গেঁথে আছে।
ফলে তিনি সেগুলো বের করতে চাইছিলেন কিন্তু আবু উবাইদা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পীড়াপীড়ির কারণে তাকে সুযোগ করে দেন। সুযোগ পেয়ে দাঁত দিয়ে টেনে ধাতব রিংগুলো বের করে আনেন আবূ উবায়দা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। এতে তাঁর সামনের দুটি দাঁত উপড়ে যায়। তারপর  ছুটে যান মারাত্মকভাবে জখম হওয়া তালহা ইবন উবাইদিল্লাহর সাহায্যে।
মিত্র আর শত্রুরা সমান তালে ছুটে আসতে থাকে রাসূলুল্লাহ -এর অবস্থান লক্ষ্য করে। স্বভাবতই তিনি তখন পুরো যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে। মানবঢাল হয়ে নবিজিকে সুরক্ষা দেন আবূ দুজানা, মুসআব ইবনু উমাইর, উমর ইবনুল খাত্তাব, আলি ইবনু আবী তালিব ও অন্যান্য সাহাবিগণ।( রদিয়াল্লাহু আনহুম।)

মুসলিমদের পতাকাবাহী মুসআব ইবনু উমাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিশানা বানায় মুশরিকরা। অসংখ্য তরবারির আঘাতে একসময় তার ডান হাত দেহ থেকে বিছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তখন পতাকাটি বাম হাতে নিয়ে নেন মুসআব। শত্রুরা একসময়

তার বাম হাতটিও কেটে ফেলতে সক্ষম হয়। তারপরও হাঁটুতে আঁকড়ে বুক আর গলার সাথে ঠেস দিয়ে পতাকা তুলে রাখেন তিনি। অবশেষে সে অবস্থাতেই আবদুল্লাহ ইবনু কামিআর তরবারির আঘাতে তিনি শহীদ হয়ে যান।

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর মুসআব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর চেহারায় ছিল দারুণ মিল। আবদুল্লাহ ইবনু কামিআ খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে বলে যে, সে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  কে মেরে ফেলেছে। পৌত্তলিক বাহিনীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গুজবটি। মুসলিমদের জন্য এটি অনেকটা শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। আচমকা এই সুসংবাদ শুনে স্বস্তির সুবাতাস বয়ে যায় মুশরিক শিবিরে। ফলে আক্রমণের চাপও কমিয়ে ফেলে তারা। কারণ, তাদের ধারণায় তাদের আসল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

চারদিক থেকে ঘেরাও হতে দেখে মুসলিমদের মূল বাহিনীতে আতঙ্ক  ছড়িয়ে পড়ে। কেউ দক্ষিণ দিকে পালিয়ে একদম মদীনা পৌঁছে যায়। কেউ পর্বতগিরির দিকে গিয়ে আশ্রয় নেয় তাঁবুতে। আর কয়েকজন যে নবিজির প্রতিরক্ষায় দৌড়ে আসেন, তা তো আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু সব মিলিয়ে কোনোকিছুই যেন সুচক পরিকল্পনামাফিক হচ্ছিল না। বেশির ভাগ সেনা অবিচল থেকে লড়াই চালিয়ে গেলেও সাংগঠনিকতার অভাবে তেমন কোনও লাভ হচ্ছিল না। বিশৃঙ্খলা এমনই পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, নিজ দলের লোকদের চিনতে না পেরে নিজেদেরই আঘাত করতে থাকে মুসলিমরা। হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বাবা ইয়ামান (রদিয়াল্লাহু আনহু) নিহত হন মুসলিমদের হাতেই। নবিজি -এর মৃত্যুসংবাদ কানে আসার পর তো যুদ্ধের ইচ্ছে যতটুকু ছিল, তাও উবে যায়। কেউ কেউ হাল ছেড়ে দিয়ে ময়দান থেকে চলে যান।

তবে কারও প্রত্যয় আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। ঘোষণা দেন, "নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম* যেটার জন্য প্রাণ দিলেন, চলো আমরাও সেটার জন্য জান বাজি রাখি।"

এই অবস্থাতেই হঠাৎ কা'ব ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবিজি -কে একঝলক দেখতে পান। শিরস্ত্রাণে চেহারা ঢাকা থাকলেও চোখ দেখে নবিজিকে চিনতে পারেন তিনি।
চিৎকার করে বলেন, "মুসলিমরা, সুসংবাদ! এই তো নবিজি! উনি বেঁচে আছেন!" এই খবরে মুসলিমদের মনোবল ফিরে আসে। দলে দলে সবাই ছুটে আসেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে। অল্পক্ষণের মাঝেই ত্রিশ জনের একটি দল আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী হয়। নবি ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়ার।তারপর সে বিপর্যয় সামাল দেন।

সেনাসারির মধ্য দিয়ে পুরো বাহিনীকে তিনি সফলভাবে পর্বতগিরির কাছে নিয়ে আসেন। পৌত্তলিকরা বাধা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে উল্টো দু'জন সৈনিক হারায়। পিছু হটে আসাটা মুসলিমদের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হয়। এমনিতেই নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি নির্দেশ অমান্য করে আজকের যুদ্ধে এই দুর্দশা। নিশ্চিত বিজয় ঘুরে গিয়ে উল্টো নিজেরাই গণহারে মারা পড়ার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু নবি তাঁর সেনাদলকে পিছু হটিয়ে এনে দক্ষ হাতে সে বিপর্যয় সামাল দেন।

## বাগ্বিতণ্ডা ও যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি

উভয়পক্ষই রণে ক্ষান্ত দেওয়ার মানসিকতায় আছে। পৌত্তলিকরা মক্কায় ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত শেষ করলে আবূ সুফইয়ান উহুদ পাহাড়ে উঠে চিৎকার করেন, "তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মাদ আছে?" নবি ও কোনও শব্দ করতে নিষেধ করায় মুসলিমদের পক্ষ থেকে কেউ কোনও জবাব দেয়নি। আবূ সুফইয়ান আবার চিৎকার দেন, "তোমাদের মাঝে কি আবু কুহাফার পুত্র আবু বকর আছে?" আবারও নীরবতা।

তৃতীয়বার আবু সুফইয়ানের চিৎকার, "তোমাদের মাঝে কি উমর ইবনুল খাত্তাব আছে?" এবারও কোনও সাড়াশব্দ নেই। নীরবতায় উৎফুল্ল হয়ে আবূ সুফইয়ান ডেকে উঠেন,

"আচ্ছা, চলো! ওই তিনটা থেকে অবশেষে মুক্তি পাওয়া গেছে।" উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এবার আর চুপ থাকতে পারলেন না।

গর্জে উঠলেন, "ওরে আল্লাহর শত্রু! যাদের নাম ধরে ডেকেছ, সবাই জীবিত আছে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের কপালে আরও বেইজ্জতি রেখেছেন, অপেক্ষায় থাকো।" আবু সুফইয়ান বললেন, "তোমাদের মুর্দাদের নাক-কান কেটে দেওয়া হয়েছে। তবে আমি এটার নির্দেশ দিইনি আবার মানাও করিনি।" তারপর উঁচু স্বরে বলে উঠলেন, "হুবালের জয় হোক!" রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশে সাহাবিরা ঘোষণা দিলেন, "আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বড় ও মহান।"

"আমাদের সাথে উযযা মা আছেন, তোমাদের কেউ নেই।" আবূ সুফইয়ানের চিৎকার। সাহাবিদের জবাব, "আল্লাহ আমাদের মাওলা, তোমাদের কোনও মাওলা নেই।" "আজ দারুণ জেতা জিতেছি। এটা বদরের প্রতিশোধ। যুদ্ধ তো (কূপের) বালতির ন্যায়। একবার এর হাতে, একবার ওর হাতে।" উমরের প্রত্যুত্তর, "এটা সমান সমান না! আমাদের মৃতরা আছে জান্নাতে, আর তোমাদের মৃতরা জাহান্নামে।"

উমরের জবাবে আবূ সুফইয়ান একটু দমে যান, পরে বলেন, "তোমরা তো এমনটাই বিশ্বাস করো। তবে বাস্তবে এমনটা হলে সত্যিই আমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত।" একটু পর বলেন, "উমর, আমি আল্লাহর নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি। সত্যি করে বলো তো, আমরা কি মুহাম্মাদকে খতম করতে পেরেছি?" "আল্লাহর কসম! পারোনি। তোমার সব কথা নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পাশে বসেই শুনছেন।" "ঠিক আছে। ইবনু কামিআর চেয়ে আমি তোমাকেই বেশি সত্যবাদী বলে জানি।"তারপর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, "তাহলে আগামী বছর বদরে আবার যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি রইল।" নবিজি -এর অনুমোদনক্রমে এক সাহাবি জবাব দেন, "ঠিক আছে। এই সিদ্ধান্তই আমাদের এবং তোমাদের মাঝে পাকাপোক্ত হয়ে থাকল।

(রাসুলে আরাবি)

# খন্দকের যুদ্ধ বা আহযাবের যুদ্ধ

পরিশেষে পঞ্চম হিজরীর যিলক্বদ মাসে কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবং দশ হাজার সৈন্যর একটি সশস্ত্র বাহিনী মদীনায় দিকে অগ্রসর হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এই সংবাদ পেয়ে সাহাবীদেরকে নিয়ে পরামর্শ করলেন।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, ময়দানের পিছনে যুদ্ধ করা সমীচিন হবে না বরং মদীনার যে দিক হতে শত্রু সেনারা প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে সে দিক দিয়ে পরিখা খনন করা হউক। সুতরাং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তিন হাজার সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে খাল খনন করার জন্য নিজেই প্রস্তুত হয়ে গেলেন। ছয় দিনের মধ্যেই দশ হাত গভীর খাল খনন হয়ে গেল। খনন কার্যে স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হস্ত মোবারকের এক অনন্য ভূমিকা ছিল।

((সীরাতে মোগলতাঈ)

একদিন খাল খনন করার সময় একটি পাথর খন্ড বেরিয়ে এল যার ফলে, খাল খনন করতে সকলেই অপরাগ হয়ে গেলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজের হস্ত মোবারকে একটি কোদাল মেরে দিলেন। ফলে টুকরা টুকরা হয়ে উড়ে গেল। মোট কথা, খাল খনন শেষ হয়ে গেল। এ দিকে কাফের কুলের সৈন্য বাহিনীরা এসে উপস্থিত হয়ে গেল এবং চারদিকে মদীনা ঘেরাও করল। আনুমানিক পনর দিন পর্যন্ত মুসলমান গণ অবরোধ অবস্থায় ছিলেন। এই সময়ে ইহুদীদের অবশিষ্ট কবিলা বনু কুরাইযাও চুক্তি ভঙ্গ করে কাফেরদের দলে প্রবেশ করে তাদের দল বৃদ্ধি করে অরোধের কারণে মদীনায় শক্ত অস্থিরতা দেখা দেয়। খাদ্য শস্যের স্বল্পতার দরুন সাহাবাগণের পালাক্রমে তিন দিন পর্যন্ত অনাহার থাকতে হল।

একদিন ক্ষুদার জ্বালায় অস্থির হয়ে সাহাবাগণ নিজেদের পেট খুলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখালেন যে, তাদের সকলের পেটেই পাথর বাঁধা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজের পেট খুলিয়া দেখালেন তার পেটে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে।'

এদিকে অবরোধকারীরা যখন পরিখা অতিক্রম করতে অপরাগ হয়ে গেল তখন ঐখান থেকেই তীর ও পাথর নিক্ষেপ শুরু করলো। উভয় পক্ষে থেকে তীর বিনিময় চলতে লাগল। এ অবস্থায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়।

সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলা এই সম্বলহীন জামআত কে সাহায্য করলেন এবং কাফের বাহিনীর উপর এমন প্রবল ঝড় তুফান প্রেরণ করলেন যে, তাদের তাবুর খুঁটিগুলো উপড়িয়ে গেল, চুলার উপর হতে হাড়ি পাতিল গুলো উল্টিয়ে গেল।

যদ্দারা কাফের বাহিনীর অবরোধ অকেজু হয়ে গেল। এ দিকে হযরত নাঈম ইবনে মাসউদ (রাঃ) এমন এক কৌশল অবলম্বন করলেন যার দ্বারা তাদের সৈন্যদের মধ্যে ফাটল দেখা দিল। মোটকথা, এমন কতকগুলো কারণ একত্রিত হল যে, কাফের বাহিনীর পা উৎপাটিত হয়ে যুদ্ধের ময়দান কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

## গাযওয়ায়ে বনু মুসতালিক বা মুরাইসী

পঞ্চম বা ষষ্ঠ ২০০ হিজরীর শা'বান মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবগত হলেন যে, বনু মুসতালিকের সর্দার হারিস ইবনে আবী যিরার মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অপর বেদুইন গোত্রগুলো নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তিনি খবরের নিশ্চয়তা পেতে বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব রাযি. কে হারিসের সাথে কথোপকথনের জন্য পাঠান। বুরাইদাহ রাযি. ফিরে এসে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। খবরের সত্যতা নিশ্চিত হলে রাসূল শা'বান এর দুই তারিখে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে রওয়ানা করেন।

এ সময় মুসলিম বাহিনীর সাথে মুনাফিকদের একটি দলও ছিলো; যারা এ প্রথমবারের মতো মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে শামিল হয়। হারিস মুসলিম বাহিনীর খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য একজন গোয়েন্দা পাঠায়। মুসলিমগণ তাকে গ্রেফতার করার পর হত্যা করে।
হারিস ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা যখন শুনলো মুসলিম বাহিনী এগিয়ে আসছেন, তখন তারা ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ও তাদের বেদুইন মিত্ররা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। রাসূল যখন মুরাইসী

নামক ঝর্ণা পর্যন্ত অগ্রসর হলেন, তখন তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলো। রাসূল মুসলিম বাহিনীকে সারিবদ্ধ করে নিলেন। কিছুক্ষণ উভয় দলের মাঝে তীর নিক্ষেপ চলতে থাকে। এরপর রাসূল আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

মুসলিম বাহিনী সহজে তাদেরকে পরাজিত করেন। মুসলিমদের একজন শাহাদাতবরণ করেন। মুশরিকদের কয়েকজন নিহত হলো। তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করা হলো। ( ইবনে ইসহাকের মতে ৬ষ্ঠ হিজরী)।

যাদুল মাআদ: /১১৫ উসওয়াতুন হাসানাহ ২১৭ কিন্তু ইবনুল কাইয়্যিম রহ. লিখেছেন, বনু মুসতালিকের সাথে কোনো যুদ্ধ হয়নি।

বরং তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা হয়। তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে আটক করা হয় ও চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে গনীমত হিসেবে নিয়ে নেওয়া হয়। ধৃত মহিলাদের মধ্যে জুওয়াইরিয়া (রাযি.) ও ছিলেন। তিনি হারিস ইবনে আবী যিরারের কন্যা ছিলেন। রাসূল তাঁকে বিবাহ করেন। এ বিবাহের ফলে সাহাবাগণ বনু মুসতালিক গোত্রের একশ' পরিবারের লোকজনকে মুক্ত করে দেন। আর বলতে থাকেন, এরা রাসূল এর শ্বশুর বংশের লোক। এরপর তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন।

## মিথ্যা অপবাদ:

বনু মুসতালিকের যুদ্ধের সময় আয়েশা রাযি. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন। ফিরে আসার সময় এক জায়গায় শিবির স্থাপন করা হয়। আয়েশা রাযি. নিজ প্রয়োজনে শিবিরের বাহিরে যান। সেখানে তাঁর হারটি হারিয়ে যায়। তিনি শিবিরে ফিরে এসে বুঝতে পারেন তাঁর হারটি হারিয়ে গেছে, তাই তিনি হারের খোঁজে বের হোন। এমন সময় রাসূল যাত্রার আদেশ দেন। সাহাবাগণ আয়েশা রাযি. এর হাওদা কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। এমনিতে আয়েশা রাযি. হালকা ওজনের ছিলেন।

তার উপর চারজনে সম্মিলিতভাবে হাওদা উঠানোর কারণে তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, তিনি কি ভেতরে আছেন নাকি নেই। হারটি পেয়ে আয়েশা রাযি. শিবিরের জায়গায় এসে দেখেন সবাই চলে গেছে। তিনি ভাবলেন যে, তাঁরা তাঁকে না পেয়ে আবার এদিকে আসতে পারে; তাই তিনি সেখানে বসে পড়লেন। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ ও আপন কাজে সদা তৎপর। তিনি আয়েশা রাযি. চোখে ঘুম জড়িয়ে দিলেন।

২৫৬. ইবনে হিশাম: ২৯০-২৯২ পৃ.: মুখতাসারুস সীরাহ: ২৭৭ পৃ. উসওয়াতুন হাসানাহ ২১৯২

অতঃপর সফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রাযি. এর কণ্ঠস্বর শুনে তিনি জাগ্রত হলেন। তিনি বলছিলেন, ইন্নালিল্লাহ! রাসূল এর স্ত্রী? সাফওয়ান (রাযি.) এর একটু বেশি ঘুমানো অভ্যাস ছিলো; তাই তিনি পেছনে পড়ে যান। আয়েশা রাযি. কে এ অবস্থায় দেখে তিনি তাঁকে চিনে ফেলেন; কেননা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন।

কেননা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। তারপর সফওয়ান রাযি. ইন্নালিল্লাহ পড়তে পড়তে তাঁর সওয়ারি বসিয়ে দেন। আয়েশা (রাযি). উঠে পড়লে তিনি লাগাম টানতে টানতে হাঁটতে থাকেন। তার মুখে সর্বক্ষণ উচ্চারিত হচ্ছিলো, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন... সাফওয়ান ( রাযি). ইন্নালিল্লাহ ছাড়া আর কিছুই বলেননি।

যখন তাঁরা কাফেলার সাথে মিলিত হোন। তখন খরতপ্ত দুপুর। মুসলিম বাহিনী তখন শিবির স্থাপন করে বিশ্রাম করছিলো। আয়েশা রাযি. কে আসতে দেখে লোকজন নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী এ ঘটনার ব্যাপারে চিন্তা করতে লাগলো। মুমিনগণ তাঁদের অন্তরের পরিচ্ছন্নতার কারণে এ সামান্য ব্যাপারটিকে সহজভাবেই নিলেন।

আর যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা একে রাসূল এর বিরুদ্ধে একটি মোক্ষম অপপ্রচারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলো।

তাদের মধ্যে আছে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। তারা মদীনায় এসে জোরালোভাবে অপপ্রচার চালাতে থাকলো। রাসূল এ অপপ্রচারের জবাব ওহীর মাধ্যমে দেবেন আশা করছিলেন। কিন্তু ওহী আসতে বিলম্বিত হওয়ায় তিনি সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন আয়েশা রাযি. এর থেকে পৃথক থাকার ব্যাপারে।

আলী রাযি. তাঁকে পৃথক হয়ে অন্য মহিলাকে বিয়ে করার পরামর্শ দিলেন। উসামা রাযি. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে শত্রুদের কথায় কান না দিয়ে আয়েশা রাযি. কে তাঁর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখার পরামর্শ দিলেন।

উসামা রাযি, ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে শত্রুদের কথায় কান না দিয়ে আয়েশা রাযি. কে তাঁর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখার পরামর্শ দিলেন।
এদিকে আয়েশা রাযি, মদীনায় আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক নাগাড়ে একমাস অসুস্থ থাকেন। তিনি এ অপবাদের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। কিন্তু এ সময় রাসূল এর কাছ থেকে যে আদর-যত্ন আশা করছিলেন; তা তিনি না পাওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলেন।

সুস্থ হওয়ার পর প্রস্রাবের উদ্দেশ্যে এক রাতে উম্মে মিসতাহের সাথে নিকটের একটি মাঠে গমন করেন। হাঁটার সময় উম্মে মিসতাহ কাপড় জড়িয়ে পড়ে যান। তখন তিনি নিজ সন্তান মিসতাহকে গালমন্দ করছিলেন। আয়েশা রাযি. তাকে গালি দিতে নিষেধ করলে, তিনি গালি দেওয়ার কারণ হিসেবে তাঁর উপর যে অপবাদ রটানো হয়েছে; তাতে মিসতাহ এর লিপ্ত হওয়ার কথা বললেন। এ খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আয়েশা রাযি. তাঁর পিতা-মাতার নিকট যেতে চাইলেন। রাসূলের অনুমতিতে তিনি পিতা-মাতার কাছে গিয়ে সংবাদের সত্যতা জেনে কাঁদতে লাগলেন। তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাঁদতেই থাকলেন।

দু'রাত ও একদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো; কিন্তু সে সময় এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর কান্না থামেনি। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি ঘুমাননি; যেন কান্নার চোটে তাঁর অন্তর ফেটে যাবে।

সেই সময় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেন ও একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এতে তিনি বলেন, আয়েশা! তোমার সম্পর্কে কিছু জঘন্য কথা এসেছে। যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও; তবে আল্লাহ তা দেবেন। আর যদি তুমি কোনো পাপ কাজ করে থাকো; তাহলে তাওবা করো। আল্লাহ তা কবুল করে নেবেন। বক্তব্য শোনার পর আয়েশা রাযি. এর অশ্রুধারা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলো।

(উসওয়াতুন হাসানাহ)

আয়েশা রাযি. তাঁর অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করে বললেন, যদি আমি নিজেকে পবিত্র হিসেবে বলি; তবে আপনাদের অন্তর তা মেনে নেবে না। কারণ আপনারা অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়েছেন।
তাই তিনি বললেন, এ জন্য আমার ও আপনাদের জন্য সে উদাহরণই যুতসই; যা ইউসুফ আ. এর পিতা তাঁর ভাইদের বলেছিলেন-

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُون َ
"ধৈর্যধারণই উত্তম। আর তোমরা যা বলছো তার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি।"

সূরা ইউসুফ: ১৮

উসওয়াতুন হাসানাহ

এরপর তিনি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। এরপর রাসূল ﷺ এর উপর আয়েশা রাযি. এর পবিত্রতা বর্ণনা করে সূরা নূরের ১১-২০ আয়াত পর্যন্ত নাযিল হলো। ওহী নাযিল শেষ হলে রাসূল মুচকি হাসলেন। তারপর তিনি তাঁকে অপবাদ থেকে মুক্তির সুসংবাদ শোনালেন।
আয়েশা রাযি. এর পিতা- মাতা তাঁকে রাসূল এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে বলেন। আয়েশা রাযি. স্বীয় সতীত্ব ও রাসূলে কারীম এর ভালোবাসার উপর ভরসা করে গর্বের সঙ্গে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি শুধুমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করবো।

এরপর মিথ্যা অপবাদের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে মিসতাহ ইবনে আসাসাহ রাযি., হাসসান ইবনে সাবেত রাযি., হামনাহ বিনতে জাহ্শ রাযি. এর উপর আশি দোররা কার্যকর করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। কারণ তাকে দুনিয়ায় শাস্তি দিলে তার আখিরাতের শাস্তি হালকা হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো বা এমন কোনো ব্যাপার নিহিত ছিলো।

এভাবে এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর মদীনার আবহাওয়া যখন গুমট অবস্থা থেকে মুক্তি পেলো। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এতই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হলো যে, সে আর দ্বিতীয়বারের মতো মাথা উঠানোর সাহস পেলো না। ইবনে ইসহাক বলেন, এরপর যখনই সে গোগুগোল পাকানোর মতলবে দাঁড়াতো তার লোকেরাই তাকে বসিয়ে দিতো। রাসূল তখন উমর রাযি. কে বললেন, যদি সেদিন তাকে হত্যা করা হতো; তবে তার সঙ্গীরা বিরূপ ধারণা পোষণ করতো। আজ তাদেরকে আদেশ দিলে তারাই তাকে হত্যা করবে। উমর রাযি. বললেন, রাসূল এর কাজ আমাদের কাজের তুলনায় অনেক বেশি বরকতপূর্ণ।

## হুদায়বিয়ার সন্ধি

শপথ গ্রহণের ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে পারে কুরাইশরাও। তড়িঘড়ি করে তারা যেকোনও মূল্যে যুদ্ধ পরিহার করে শান্তি স্থাপনে সচেষ্ট হয়। এ উদ্দেশ্যে সুহাইল ইবনু আমরকে পাঠানো হয় পরবর্তী দূত হিসেবে।

সুদীর্ঘ আলোচনার পর এই শর্তগুলোর ব্যাপারে সম্মত হয় উভয়পক্ষ:

প্রথমত, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা সে বছর উমরা না করেই ফিরে যাবেন। পরের বছর উমরা করতে মক্কায় আসবেন। থাকতে পারবেন শুধু তিন দিন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের কারও সাথে খাপবদ্ধ একটি তরবারি ছাড়া অন্য কোনও অস্ত্র থাকতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, দশ বছর মেয়াদে একটি শান্তিচুক্তি কার্যকর থাকবে। তৃতীয় কোনও পক্ষ যদি মুসলিমদের সাথে চুক্তি করতে চায়, করতে পারবে। কুরাইশদের সাথে করতে চাইলেও করতে পারবে। তৃতীয়ত, মক্কা থেকে কেউ মদীনায় পালিয়ে গেলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোনও অনুসারী মক্কায় ফিরে এলে কুরাইশরা তাকে মদীনায় ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না। চুক্তিনামাটি লেখার জন্য আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডাকিয়ে আনেন রাসূলুল্লাহ। বললেন, "লেখো, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।"

বাগড়া দিয়ে বসল সুহাইল, "আমরা রহমানকে জানি না, চিনি না। আপনি 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লেখেন।" নবি তাতেই সম্মতি দিলেন। এরপর লিখতে বলেন, 'এই কথার ওপর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ চুক্তি করেছেন..." আবারও সুহাইলের আপত্তি, "আপনাকে যদি আল্লাহর রাসূল বলে আমরা স্বীকারই করতাম,তাহলে তো আপনাকে বাইতুল্লাহয় যেতে বাধাও দিতাম না, আর আপনার সাথে যুদ্ধও করতাম না।

নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেও আমি আল্লাহর রাসূল।" তারপর আলিকে বললেন, আগে লেখা "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ" অংশটা মুছে দিয়ে "মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ" লিখতে। আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) অনুযোগ করলেন, "আল্লাহর কসম! আমি কখনও এমনটি করতে পারি না।" পরে নবি বললেন উল্লেখিত অংশটা কোথায় আছে দেখিয়ে দিতে। আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) তা দেখিয়ে দিলে নবিজি নিজ হাতে সে অংশটুকু মুছে দেন।তারপর চুক্তিনামার দুটি অনুলিপি লেখা হয়। একটি কুরাইশদের কাছে থাকবে, আরেকটি মুসলিমদের কাছে।

# খাইবারের যুদ্ধ

## প্রেক্ষাপট

খাইবারের ইহুদিরা মাক্কী যুগে কিংবা মদীনার প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করেনি। কিন্তু বনু নাযিরের নেতাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকে মুসলিমদের প্রতি তাদের মনোভাব বদলে যেতে থাকে। বনু কায়নুকা, বনু নাযির এবং বনু কুরায়যা-- এই তিনটি গোত্রকেই পর্যায়ক্রমে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। বনু নাযিরকে বের করে দেওয়া হলে তারা আশ্রয় নিয়েছিল খাইবারে। আর এরপর থেকেই খাইবারের ইহুদিরা মুসলিমদের সাথে বিদ্বেষ দেখাতে শুরু করলো। কেননা বনু নাযিরের বিভিন্ন নেতা যেমন সালাম ইবন আবি আল-হুকাইক, কিনানাহ ইবন আবি আল-হুকাইক, হুয়াই ইবন আখতাব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ খাইবারের রাজনীতিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তারাই খাইবারের ইহুদিদেরকে আল্লাহর রাসূল এবং মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে উসকে দেয়। খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ এবং গাতফানকে এক করে সম্মিলিত সামরিক জোট গঠন করে এবং গাতফানকে বিপুল অর্থ দেওয়ার আশ্বাস দেয়। এভাবেই নিরপেক্ষ খাইবার হঠাৎ করেই মুসলিমদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের সময়টা ছিল তাদেরকে আক্রমণ করার সবচাইতে উপযুক্ত সময়। কেননা ততদিনে হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশদের দশ বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই খাইবার আক্রমণ করা হলে কুরাইশদের থেকে প্রতিরোধের কোনো সম্ভাবনা নেই। অভিযানের সূচনা খাইবারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী সপ্তম বর্ষে। হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদন করে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের বিশ দিনের মাথায় আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবিদের নিয়ে খাইবার অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। গোটা আরব উপদ্বীপে ইহুদিদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল খাইবারে। মুসলিমরা জানতেন খাইবারে তাদের বিজয় হবেই। কারণ কয়েকদিন আগেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে খাইবারে বিজয়ের ওয়াদা করেছেন।

"...তাদেরকে পুরষ্কৃত করলেন আসন্ন বিজয় দিয়ে। এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে..." (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১৮-১৯)

## মুখোমুখি মুসলিম এবং খাইবারের ইহুদিরা

খাইবার ছিল এক বিশাল এলাকা জুড়ে অনেকগুলো দুর্গের সমাহার। এই দুর্গগুলো খাইবারের বিভিন্ন স্থানে, পাহাড় পর্বতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ কারণে খাইবার যুদ্ধ ইহুদিদের সাথে আগের সব যুদ্ধগুলোর তুলনায় বেশ জটিল ছিল। অবস্থানগত দিক থেকেও খাইবার ছিল সুরক্ষিত একটি এলাকা। রাসূলুল্লাহ এক এক করে সবগুলো দুর্গ জয় করার জন্য অগ্রসর হলেন।

শুরু হলো নাঈম দুর্গ দিয়ে। যুদ্ধ শুরু হলো। ইহুদিদের এক সাহসী যোদ্ধা বেরিয়ে এল, তার নাম মারহাব। সে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ডাক দিল। মুসলিমদের মধ্য থেকে এগিয়ে গেলেন আমীর ইবন আল- আকওয়া, যার কথা একটু আগেই এসেছে। তিনি খাইবারের যাত্রাপথে নাশীদ  গেয়ে সবাইকে চাঙ্গা করে রেখেছিলেন। দু'জন দু'জনকে আঘাত করে কাবু করতে চাইলেন। এক পর্যায়ে মারহাব তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে চাইলে সেই তলোয়ার আমীরের ঢালে আটকে যায়। সেই সুযোগে আমীর মারহাবের উরুতে আঘাত করে তাকে শেষ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর তলোয়ার ছোট হবার কারণে আঘাত করতে গিয়ে তলোয়ার ধাক্কা খেয়ে তার নিজের হাঁটুতে লাগে। এই আঘাত থেকে শুরু হয় রক্তক্ষরণ আর সেই রক্তক্ষরণ থেকে মৃত্যু। এভাবেই আমীর শহীদ হয়ে গেলেন, আল্লাহর রাসূলের দুআ কবুল হলো। এরপর আমীরের জায়গায় আসলেন আলী। এসেই মারহাবকে হত্যা করলেন। অবশ্য অন্য বর্ণনামতে মারহাবকে হত্যা করেছিলেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ। জীবন সবসময় মানুষের পরিকল্পনামাফিক চলে না। আমীর বীরের মতো শত্রুর দিকে আঘাত হানতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার বদলে নিজেই নিজের তরবারিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়লেন।

(সিরাহ)

লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো আমীরের সকল আমল ধ্বংস হয়ে গেছে, সে আত্মহত্যা করেছে। চাচার ব্যাপারে এই কথা শুনে সালামা ইবন আল আকওয়ার খুব মন খারাপ হলো।

রাসূল  সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে জানতে চাইলেন কী হয়েছে। সালামা জানতে চাইলেন, 'আমার চাচার সকল আমল কি ধ্বংস হয়ে গেছে ইয়া রাসূলাল্লাহ? রাসূল তাকে আশ্বাস দিয়ে প্রত্যুত্তরে বললেন, 'যে এই কথা বলেছে সে

সে মিথ্যে বলেছে। আমীর দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে!' ইহুদিদের এই নাঈম দুর্গ মুসলিমদের পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবরোধের প্রথম কিছুদিন আবু বকরের হাতে ছিল মুসলিম বাহিনীর পতাকা। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে বিজয় আসছিল না। সবাই যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, এমন সময় আল্লাহর রাসূল ঘোষণা দিলেন, 'আগামীকাল আমি এমন একজনকে পতাকা দান করবো যার জন্যে আল্লাহ দুর্গের দরজা খুলে দিবেন।
সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, এবং আল্লাহ আর তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসে।' এই ঘোষণা যেন টনিকের মতো কাজে দিল। সবার ক্লান্তি নিমিষে কোথায় চলে গেল। কার হাতে আল্লাহর রাসূল ও পতাকা তুলে দেবেন সেটা ভেবে সবাই রোমাঞ্চিত বোধ করতে লাগলেন। পরদিন সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর কাছে জড়ো হলেন। মনে মনে সবাই আশা করছিলেন- ইশ! আল্লাহর রাসূল যদি আমার হাতে পতাকা তুলে দিতেন!

উমার ইবন খাত্তাব নিজেই বলেছেন তার মনে সেদিন কী ছিল। তিনি বলেছেন, 'আমি কোনোদিন নেতৃত্ব বা পদের আকাঙ্ক্ষা করিনি। তবে খাইবারের সেই দিনে আমার মনে নেতৃত্বের আশা জেগেছিল।' সবাইকে ছাপিয়ে সেদিন যিনি পতাকা লাভ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন আলী ইবন আবি তালিব। কিন্তু যিনি এই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হলেন, তিনি নিজেই ছিলেন খাইবারের যুদ্ধ।  সকাল বেলা আলী সেখানে ছিলেন না। সাহাবিরা জানালেন আলী চোখের সমস্যায় ভুগছেন। রাসূল  সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর মুখের কিছু লালা আলীর চোখে লাগিয়ে দিলেন আর সাথে সাথে আলী সুস্থ হয়ে উঠলেন। আল্লাহর রাসূলের আরও একটি মু'জিযা। এরপর তার হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন, 'এগিয়ে যাও। আল্লাহ বিজয় দান করা পর্যন্ত পিছু হটো না।' আলী জানতে চাইলেন, 'কোন কথার উপর আমি লোকদের সাথে লড়াই করবো? রাসূলুল্লাহ বললেন, 'তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। যখনই তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে তখনই তাদের জান-মাল তোমার হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে (আইনগত) অধিকারের কথা হলে ভিন্ন। আর তাদের (আন্তরিকতার) হিসাব আল্লাহর কাছে। আলী হুংকার দিতে দিতে এগিয়ে চললেন। সাহাবিরাও তার পিছু পিছু ছুটছেন। দুর্গের সামনে এসে পতাকাটি পাথরের মধ্যে গেঁথে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে ইহুদিরা জিজ্ঞেস করলো, - কে তুমি? - আমি

আলী ইবন আবি তালিব। - তাওরাতের কসম! তোমরা আমাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছো! দশ দিনের মাথায় শেষ পর্যন্ত আলীর নেতৃত্বে নাঈম দুর্গ জয় হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূলের ওয়াদা সত্য হলো।

এরপর মুসলিমরা অগ্রসর হলেন আস-সা'ব দুর্গের দিকে। তিন দিনের মাথায় আস-সা'ব দুর্গ জয় হলো। এ জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন আল-হাব্বাব ইবন আল-মুনযির। এই দুর্গ জয়ের মাধ্যমে মুসলিমরা অনেক খাদ্যের সন্ধান পেলেন। এরপর তারা অগ্রসর হলেন আয-যুবাইর দুর্গের দিকে। সেখানে তাদের অবরোধ করে তাদের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার তিন দিনের মাথায় তারা যুদ্ধ করতে নেমে আসলো এবং পরাজিত হলো।

এরপর মুসলিম সেনাবাহিনী অভিযান চালালো উবাই দুর্গে। গোলাবর্ষণের মাধ্যমে খুব সহজে উবাই দুর্গ আয়ত্তে চলে আসলো।

এরপর মুসলিমরা একে একে জয় করলেন আল-কাম্‌স, আল-ওয়াতীহ এবং আস-সুলালাম দুর্গ। চৌদ্দ দিন অবরোধ করে রাখার পর এই দুর্গের ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়। এভাবেই বিজয় হলো সমগ্র খাইবার। এরপর ইহুদিরা অস্ত্র ছেড়ে সন্ধি আলোচনার জন্য নেমে আসে। এ যুদ্ধে নিহত হয় তিরানব্বই জন ইহুদি। আর মুসলিমদের থেকে শহীদ হন পনেরো থেকে বিশ জন, আল্লাহই ভালো জানেন।

**বিষাক্ত খাবারের ঘটনা**

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বার বিজয়ের পর আরামবোধ করলেন। তখন সাল্লাম ইবনে মিশকামের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারিস বকরির গোশত ভুনা করে পাঠালো। সে জেনে নিয়েছিলো যে, রাসূল রানের গোশত পছন্দ করেন। তাই সে গোশতের সাথে ভালো করে বিষ মেশালো। তারপর তা রাসূল এর কাছে নিয়ে আসে। রাসূল রানের কিছু অংশ উঠিয়ে খাওয়া শুরু করে কিছু অংশ চিবানোর পর মুখ থেকে ফেলে দেন। বলেন, এ হাড্ডি আমাকে বলছে যে, এর সাথে বিষ মেশানো হয়েছে। তারপর যায়নাবকে ডাকা হলে সে সত্যতা স্বীকার করে বলে, আমি জানতে চেয়েছিলাম, যদি বাদশা হোন: তবে আমরা তাঁর থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবো। আর তিনি যদি নবীই হোন; তবে আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দেবেন। ফলে তিনি বেঁচে যাবেন। এরপর তাকে

ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরে যখন এ গোশত খাওয়ার কারণে বিশররাযি. মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাকে হত্যা করা হয়।

যাদুল মাআদ: ২/১৩৭; ইবনে হিশাম: ২/৩৩৬

## সারিয়া মুতার এবং মক্কা বিজয়

মুতা শামের (সিরিয়ার) বাল্কা শহরের অদূরবর্তী বায়তুল মুকাদ্দাস হতে দুই মনিল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এই খানে মুসলমান ও রোমাদের মধ্যে সর্ব বৃহৎ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধের কারণ এই ছিল যে, রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বসরার গর্ভণর আমর ইবনে উমায়ের (রাঃ) কে হত্যা করেছিল।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্য অষ্টম হিজরী সনের মাঝামাঝি তিন সাহাবার একটি দল প্রেরণ করলেন। মুসলমান সৈনিকেরা যখন মুতায় উপনীত হল তখন রোমানরা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের মুকাবেলার জন্য অগ্রসর হল।

দীর্ঘ কয়েক দিন যুদ্ধ হবার পর আল্লাহ তায়ালা দেড়লক্ষ কাফের বাহিনীর উপর তিন হাজার মুসলমানের ভয় এমন ভাবে ঢেলে দিলেন যে, পিছু হঠে যাওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোন উপায় ছিলনা।
(তাল্খীসুস্ সীরাত দ্রঃ)

**মক্কার পথে**

অষ্টম হিজরির ১০ রমাদান। মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বেরোলেন নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাথে আছেন পুরো দশ হাজার সাহাবি। মদীনার দায়িত্বে রেখেছেন আবু রুহম গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে। জুহফায় এসে নবিজি ও তাঁর চাচা আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দেখা পান। ইসলাম গ্রহণ করে মাত্রই সপরিবারে মদীনায় আসছিলেন তিনি। নবি  সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচাতো ভাই আবূ সুফইয়ান ইবনুল হারিস এবং ফুপাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়াও এ পথ ধরেই যাচ্ছিলেন। 'আবওয়া' নামক স্থানে তারা নবিজির সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু নবিজি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। দু'জনেই এককালে ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে অনেক কষ্ট দিয়েছিল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে। নবিজিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখে উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহা) নবিজিকে বলেন, "এমন হওয়া তো উচিত নয় যে, আপনারই চাচাতো, ফুপাতো ভাইয়েরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগা হবে?" আর আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) আবু সুফইয়ানকে উপদেশ দেন, নবিজি -এর কাছে গিয়ে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ভাইদের মতো করে ক্ষমা চাইতে।

[৪৫৮] বুখারি, ৩০০৭। [৪৫৯

(এই আবু সুফইয়ান এবং মুশরিকদের সেনাপতি আবু সুফইয়ান ইবনু হারব আলাদা ব্যক্তি।) তারা বলেছিল- تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِين

"আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর নিশ্চয়ই আমরা পাপাচারী।

সূরা ইউসুফ, ১২: ১৯১।

লজ্জিত আবূ সুফইয়ান নবিজির কাছে এসে ওই কথারই পুনরাবৃত্তি করে। ফলে নবিজি -ও ঠিক সেই জবাবই দেন, যা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) দিয়েছিলেন তাঁর ভাইদের উদ্দেশ্যে:

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

"আজ তোমাদের প্রতি কোনও আক্রোশ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সব দয়ালুর চাইতে অধিক দয়ালু।
সূরা ইউসুফ, ১২:৯২।

ক্ষমা পেয়ে উচ্ছ্বসিত আবূ সুইয়ান কয়েকটি পঙ্ক্তিত আবৃত্তি করে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রশংসা করেন এবং নিজের অপারগতা প্রকাশ করেন। কাদীদে পৌঁছানোর পর নবিজি দেখেন সাহাবিদের সিয়াম ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি নিজে সিয়াম ভেঙে সাহাবিদেরও ভাঙার নির্দেশ দেন।তারপর যাত্রা পুনরারম্ভ করে প্রায় ইশার ওয়াক্তে এসে পৌঁছান মাররুয যাহরানে। প্রতিটি সৈনিককে নিজের জন্য একটি করে আগুন জ্বালাতে বলা হয়। ফলে পুরো এলাকায় জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে দশ হাজার আগুন। পুরো বিষয়টি তদারক করেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

এতগুলো আগুন দেখে তাঁবুর সংখ্যা চিন্তা করে মাথা ঘুরে যায় মুশরিক সেনাপতি আবূ সুফইয়ান ইবনু হারবের। হাকীম ইবনু হিযাম আর বুদাইল ইবনু ওয়ারাকা তার সাথেই ছিল। তাদের এই দৃশ্য দেখিয়ে বলেন, "এর আগে এত বিরাট শিবির আর আগুন আমার জীবনে কখনও দেখিনি!" বুদাইল বললেন, "এরা মনে হচ্ছে খুযাআ?" আবূ সুফইয়ান বললেন, "খুযাআ তো এরচেয়ে অনেক কম এবং দুর্বল।
তাদের সাধ্য নেই এতবড় সেনাবাহিনী তৈরি করার।

[৪৬২]ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ২/১৬২-১৬৩/ [৪৬৩] বুখারি, ৪২৭৫। :

**নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর কাছে আবু সুফিয়ান**

নবিজি -এর খচ্চরের পিঠে চড়ে ঘোরাফেরা করছিলেন আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু।) এমন সময় একটি কণ্ঠস্বর শুনে সাথে সাথে চিনে ফেলেন তিনি। ডেকে ওঠেন, "আবূ হানযালা নাকি?" আবূ সুফইয়ান জবাব দেন, "জি। আপনি কি আবুল ফাদল?” "হ্যাঁ।" "আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরাবান হোক! বলুন তো, ঘটনা কী?" "ঘটনা কিছুই না। আল্লাহর রাসূল । তাঁর সেনাদল নিয়ে বের হয়েছেন। কুরাইশদের ধ্বংস অত্যাসন্ন।" "আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক! এখন উপায়?" "মুসলিমরা

কেউ আপনার উপস্থিতি টের পেলে সাথে সাথে মেরে ফেলবে। আসেন, আমার খচ্চরের পেছনে ওঠেন। আমি আপনাকে সরাসরি নবিজির কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" আবূ সুফইয়ান উঠে বসলেন আব্বাসের খচ্চরের পেছনে। দু'জনে গিয়ে পৌঁছালেন নবিজি -এর সাথে সাক্ষাৎ করতে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) দেখামাত্র বললেন, "আবূ সুফইয়ান, আল্লাহর শত্রু! সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর, যিনি তোমাকে কোনও চুক্তি ছাড়াই আমাদের কব্জায় তুলে দিলেন।"

অনাহূত এই অতিথির কথা নবিজিকে জানাতে ছুটে গেলেন উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। খচ্চর চালিয়ে উমরের আগেই পৌঁছে গেলেন আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)। উমর তাতে দমার পাত্র নন। নবিজি অনুমতি চান তিনি। নবিজির কাছে গিয়ে আবূ সুফইয়ানকে হত্যার অনুমতি চান।আব্বাস বাধা দিলেন, "আমি নিরাপত্তা দিয়েছি উনাকে।" তারপর তিনি আলতো করে নবিজির মাথায় হাত রেখে বলেন, "আজ রাতে আল্লাহর রাসুলের সাথে শুধু আমি কথা বলব।" উমর বারংবার অনুমতি চাইতে থাকেন আবু সুফইয়ানকে হত্যার। কিন্তু নবি ও কিছু না বলে চুপ থাকেন। কিছুক্ষণ পর আব্বাসকে নবিজি বলেন, "উনাকে (আবূ সুফইয়ানকে) আপনার ঘরে নিয়ে যান। কাল সকালে আমার নিকট নিয়ে আসবেন।" সকাল হলো, আবূ সুফইয়ানও এল। নবি তাকে বললেন, "আবু সুফইয়ান, আপনার জন্য আফসোস! আপনার কি এখনও সময় আসেনি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য বলে মেনে নেওয়ার?" আবূ সুফইয়ান বললেন, "আমার বাবা-মা আপনার তরে কুরবান হোক! আপনি কতই-না দয়ালু, নম্র আর মহান! আল্লাহ ছাড়া যদি আর কোনও উপাস্য থাকতই, তাহলে আজ পর্যন্ত নিশ্চয়ই সে আমার কোনো-না-কোনো সাহায্য করত।"

নবি আবারও বললেন, "আবু সুফইয়ান, আপনার জন্য আফসোস! আপনার কি এখনও সময় আসেনি আমাকে নবি ও রাসূল বলে মেনে নেওয়ার?" আবূ সুফইয়ান বললেন, "এটা নিয়ে আমার এখনও একটু সন্দেহ আছে।" আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) মাঝপথে বাধা দিলেন, "এটা বোঝার আগে আগেই আপনার গর্দান কাটা যাবে। ইসলাম গ্রহণ করে নিন।" এরপর আবূ সুফইয়ান ইবনে হারব (রদিয়াল্লাহু আনহু) কালিমাতুশ শাহাদাহ পাঠ করে ইসলামে প্রবেশ করেন। আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) অনুনয় করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু সুফইয়ান মর্যাদা ভালোবাসে। ওনাকে একটু মর্যাদা

দিয়ে দিন।" নবি বললেন, "হ্যাঁ। যে কেউ আবূ সুফইয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে কেউ নিজ নিজ ঘরের দরজা আটকে দেবে, সেও নিরাপদ। আর যারা মাসজিদুল হারামের ভেতরে প্রবেশ করবে, তারাও নিরাপদ। "

[৪৬৪] মুসলিম

**নবি-(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মক্কায় প্রবেশ**

সেদিন সকালেই শিবির ছেড়ে মক্কার উদ্দেশে রওনা হন নবি। আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্দেশ দেন আবূ সুফইয়ান ইবনু হারব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে উপত্যকার শেষ মাথায় পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যেতে। মুসলিম বাহিনীর কুচকাওয়াজ যেন ভালো করে চোখে পড়ে তার। আব্বাস তা-ই করেন। আর আবূ সুফইয়ান অবাক বিস্ময়ে দেখেন সাগরের মতো সুবিশাল এক সেনাদলকে। একেকটি গোত্রের হাতে একেক রঙের পতাকা। একটি দল পার হয় আর আবূ সুফইয়ান তাদের নাম জিজ্ঞেস করেন। গোত্রটির নাম জানার পর বলেন, "এদের সাথে আমার কী সম্পর্ক?" তারপর সা'দ ইবন উবাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে দৃপ্ত পদক্ষেপে আসে আনসারদের দলটি। পতাকাবাহী সা'দ ইবন উবাদা আবু সুফইয়ানকে দেখতে পেয়ে ডেকে ওঠেন, "আবু সুফইয়ান, আজ সংঘর্ষ আর রক্তপাতের দিন, আজকে কা'বার পবিত্রতা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে!!" আবু সুফইয়ান পাশ ফিরে বললেন, "আব্বাস, ধ্বংস আর রক্তপাতের দিন মুবারক হোক!" সবশেষে আসা দলটিকে দেখে আবূ সুফইয়ান যথারীতি বললেন, “আব্বাস, এরা কারা?" আব্বাস জানালেন যে, এবার মুহাজির ও আনসারদের সারি সাথে নিয়ে স্বয়ং নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছেন। আবূ সুফইয়ান আবারো ভালো করে দেখলেন। বললেন, "কার সাধ্যি এদের থামানোর? আপনার ভাতিজার রাজ্য আজ সত্যিই চোখ-ধাঁধানো আকৃতি লাভ করেছে।" আব্বাস বললেন, "এটি হলো নুবুওয়াত।" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আবূ সুফইয়ান, "হ্যাঁ। বাস্তবেই।" সা'দের ওই কথাটি আবূ সুফইয়ানকে ভীষণ ভীত করে রেখেছিল। নবিজির কাছে এ কথার ব্যাপারে অনুযোগ করেন তিনি। রাসূল খুবই রাগ করেন সা'দের এমন দাম্ভিক উক্তি শুনে। জবাব দেন, "সা'দ মিথ্যা বলেছে। আজকের এই দিনে আল্লাহ তাআলা কা'বাকে সম্মানিত করবেন। আজ কা'বাকে গিলাফ পরানো হবে।" এই বলে নবি সা'দের হাত

থেকে পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরই ছেলে কাইস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে তুলে দেন। বিজয়ের আনন্দের অতিশয্যে মক্কাবাসীদের ওপর হয়তো জুলুম করে ফেলবেন সা'দ (রদিয়াল্লাহু আনহু), এমন শঙ্কা থেকেই নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ওদিকে আবূ সুফইয়ান ইবন হারব (রদিয়াল্লাহু আনহু) দ্রুত মক্কায় ফিরে গিয়ে লোক জড়ো করে ঘোষণা দিলেন, "ওহে কুরাইশ জনগণ, যে সেনাশিবির দেখেছিলাম, ওটা মুহাম্মাদের।

১৭৮০; তহাবি, শারহু মাআনিল আসার, ৩/৩২০।

য়

তিনি আজ অপ্রতিরোধ্য এক সেনাদল নিয়ে এগিয়ে আসছেন। আজ তাঁদের কেউ ঠেকাতে পারবে না। এ জন্যে তিনি বলেছেন, যারা যারা আবু সুফইয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, তারা নিরাপদ।" কেউ একজন রাগত-কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আপনার ওপর আল্লাহর লা'নত! আপনার ঘরে কতজন লোকেরই-বা জায়গা হবে?" আবূ সুফইয়ান বললেন, "এবং যারা নিজ নিজ ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখবে, তারাও নিরাপদ। আবার যারা কা'বায় ঢুকে যাবে, তারাও নিরাপদ।" এ কথা শুনেই সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে দ্রুত নিজ নিজ ঘরে, আর কা'বার দিকে ছুটতে থাকে। এদিকে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পৌঁছালেন যূ-তুওয়ায়।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্দেশ দিলেন বামদিকের

সেনাসারিকে নিয়ে 'কুদা' হয়ে মক্কার নিম্নভূমিতে প্রবেশ করতে। কুরাইশদের কেউ বাধা দিতে আসলেই কতল। সেনা- সারিটি সাফা পর্বতের কাছে গিয়ে আবার নবি -এর সাথে মিলিত হবে। নবিজির পতাকাবাহী এবং ডান সেনা-সারির নেতা যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রদিয়াল্লাহ আনহু)-কে বলা হলো 'কাদা'র ওপরের অংশ দিয়ে মক্কায় ঢুকতে। সামনে এগিয়ে গিয়ে পতাকা গাড়তে হবে হাজ্বনে। নবিজি এসে পৌঁছানো পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করবেন তিনি। আর পদাতিক বাহিনী ও নিরস্ত্র সেনাদের নেতা আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) 'বাতনু ওয়াদি' দিয়ে মক্কায় নামবেন। তারই পেছন পেছন আসবেন আল্লাহর রাসূল। কুরাইশরা এ-সময় সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, ইকরিমা ইবনু আবী জাহল এবং সাহল ইবনু আমরের নেতৃত্বে খান্দামায় একটি সেনাদল নিযুক্ত করে। এটাই আজ তাদের প্রথম প্রতিরক্ষা-সারি এবং এটাই

শেষ। মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে যদি এদের পতন ঘটে, তাহলে মক্কার ওপর মুসলিম-আধিপত্য মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প রইবে না। আসলেও সেদিন কুরাইশদের সামনে আল্লাহর ফায়সালা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। দীর্ঘ প্রায় একুশ বছর ধরে সব অত্যাচার-আক্রমণকে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য ও প্রতিরোধ করেছে মুসলিমরা। আজ সময় এসেছে অবিসংবাদিত ও চূড়ান্ত বিজয়ী হিসেবে আল্লাহর রাসূল -এর মক্কায় প্রবেশ করার। খালিদ-বাহিনীর সাথে মাক্কি প্রতিরোধ বাহিনীর হালকা সংঘর্ষ হয়। ফলে বারো জন মুশরিক নিহত হয়, বাকিরা পিঠটান দেয় মক্কার দিকে। এরপর বিনা বাধায় মক্কায় ঢুকে পড়েন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর দল। নির্বিঘ্নে কুচকাওয়াজ  করতে করতে এগিয়ে চলেন মক্কার রাজপথ আর অলিগলি ধরে। অবশ্য তাদের থেকে পৃথক হয়ে পড়া দু'জন সাহাবি শহীদও হয়েছিলেন। অবশেষে সাফা পাহাড়ের কাছে এসে কথামতো নবি-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন খালিদ। ওদিকে যুবাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু) হাজনে পৌঁছে ফাতহ মাসজিদের কাছে পতাকা গাড়েন। উম্মু সালামা এবং মাইমুনা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর জন্য সেখানে একটি তাঁবু খাটান তিনি। তারপর তাঁরা নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশমতো তাঁর আসার অপেক্ষায় থাকেন। নবিজি সেখানে পৌঁছে একটু বিশ্রাম করে আবু বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে সাথে নিয়ে আবারও এগোতে শুরু করেন। অবশেষে আল্লাহর নির্ধারিত সেই মুহূর্ত চলে আসে। তাঁর বান্দারা এখন স্বাধীনভাবে তাঁর ইবাদাত করবে। বিজয়ী, অথচ বিনয়ী বেশে অনুসারীদের মধ্যমণি হয়ে সূরা ফাতহ তিলাওয়াত করতে করতে মক্কায় প্রবেশ করেন মুহাম্মাদ  সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বুখারি, ৪২৮০; ইবনু হিশাম, ৩১/4।বুখারি, ৪২৮৭।

## মাসজিদে হারামে প্রবেশ ও মূর্তি ভাঙন

মাসজিদুল হারামে আগমন করে রাসূল হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করলেন। তারপর আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলেন। তখন রাসূল এর হাতে একটি ধনুক ছিলো। মুশরিকরা

কা'বা ঘরের আশপাশে ও ছাদের উপর যেসব মূর্তি স্থাপন করেছিলো। তিনি ধনুক দিয়ে সেগুলোকে আঘাত করে ভাঙছিলেন আর মুখে বলছিলেন-

)جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (

হক্ক এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। আর বাতিল তো বিলুপ্ত হওয়ারই ছিলো।

(সূরা ইসরা)

)قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيد ( ُ

বলুন! সত্য সমাগত। নতুন করে মিথ্যার আবির্ভাব ঘটবে না। আর তা পুনরায় আসবেও না।

(সূরা সাবা: ৪৯)

তাওয়াফ শেষ হলে তিনি উসমান ইবনে তালহা (রাযি.) কে ডেকে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে কা'বা ঘরের চাবি নিলেন এবং কা'বা ঘর খোলা হলো। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলে ভেতরের ছবিগুলো তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। সেখানে ইবরাহীম আ. ও ইসমাইল আ. এরও প্রতিকৃতি ছিলো। কা'বা ঘরে একটি কাঠের তৈরি কবুতরির মূর্তি ছিলো। তিনি তা ভেঙে ফেলেন। অন্য সকল প্রতিকৃতি তাঁর নির্দেশে মুছে ফেলা হয়।

উসওয়াতুন হাসানাহ

**কা'বা পবিত্রকরণ ও সালাত আদায়**

আল্লাহর ঘর তওয়াফ শেষে উসমান ইবনু তালহাকে ডাকিয়ে আনেন রাসূল । উসমান কা'বার চাবি-রক্ষক। তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে নবিজি কা'বার দরজা খোলেন। ভেতরে রাখা মূর্তিগুলোও বের করে এনে ভেঙে ফেলা হয়, মিটিয়ে দেওয়া হয় সব ছবি ও চিত্র। এরপর উসামা ইবনু যাইদ এবং বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে সাথে নিয়ে নবিজি ভেতরে ঢুকে কা'বার দরজা আটকে দেন। সামনের দেয়ালের দিকে মুখ করে এ থেকে প্রায় তিন হাত দূরত্বে দাঁড়ান তিনি। একটি খুঁটি বামদিকে, দুটি ডানদিকে আর পেছনে তিনটি। সেখানে দাঁড়িয়ে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু-রাকাআত সালাত আদায় করেন। তারপর আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করতে করতে হেঁটে বেড়ান মাসজিদুল হারাম ঘিরে।

**শত্রুদের পরিণাম**

নবিজি যখন দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন, ততক্ষণে চারপাশে কুরাইশদের ভিড় জমে গেছে। দুরুদুরু বুকে তারা বিজয়ী প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। কা'বার দরজার কাঠামো ধরে দাঁড়ান মহানবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। কুরাইশরা সবাই এসে তাঁর সামনে জড়ো হয়। একসময়কার দুর্বিনীত নিপীড়ক, আজ তারা সবাই সবিনয়ে উপস্থিত। নবি একটি দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন ইসলামের কিছু আদেশ-নিষেধ এবং বাতিল করেন সকল মুশরিকি প্রথা-প্রচলন। তারপর প্রশ্ন রাখেন, "কুরাইশগণ, আমার কাছ থেকে কেমন আচরণ আশা করেন?" কুরাইশরা উত্তর দেয় "সবচেয়ে উত্তম আচরণ। আপনি আমাদের সম্মানিত এক ভাই এবং সম্মানিত এক ভাইয়ের সন্তান।" নবি জবাব দেন, لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء "আজ আপনাদের প্রতি কোনও আক্রোশ নেই। যান, আপনারা সবাই মুক্ত।" ধীর পায়ে নেমে এসে মাসজিদ প্রাঙ্গণে বসেন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) । উসমান ইবনু তালহার হাতে চাবি বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, "চাবিটা তোমার কাছে আজীবন থাকবে। যে ছিনিয়ে নিতে চাইবে, সে জালিম।

বুখারি, ১৬০১। [৪৭০] তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত, ১/১৫৫।

**দাগি আসামিদের মৃত্যুদণ্ড**

সাধারণ ক্ষমা বহাল থাকলেও কিছু দাগী অপরাধীকে সেদিন মৃত্যুদণ্ড দেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাদের দেখামাত্র হত্যার নির্দেশ দেন, এমনকি তারা কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে ঝুলে থাকলেও। অবশেষে তাদের ঘিরে ধরেছে আল্লাহর ক্রোধ। প্রশস্ত পৃথিবী তাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। ইসলামবিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণের দায়ে দোষী সমগ্র মক্কাবাসী। এর মাঝে মাত্র চার জনকে সেদিন হত্যা করা হয়। ইবনু খাতাল, মিকইয়াস ইবনু সুবাবা, হারিস ইবনু নুফাইল এবং ইবনু খাতালের এক দাসী। কিছু কিছু সূত্রে অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, হারিস ইবনু তালাতিল খুযাঈ এবং উম্মু সা'দও মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে। তবে উম্মু সা'দ সম্ভবত ইবনু খাতালের সেই দাসীও হতে পারে। তাই সব মিলিয়ে এমন আসামীর সংখ্যা সর্বোচ্চ ছয়। আরও চার জন মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পেরেছিলেন সেদিন। প্রথমে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়েছিলেন তারা। তারপর ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণের কথা জানান।

ফলে মাফ করে দেওয়া হয় তাদের। এরা হলেন আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ  ইকরিমা ইবনু আবী জাহল, হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ এবং ইবনু খাতালের আরেক দাসী। কিছু উৎসে কা'ব ইবনু যুহাইর, ওয়াহশি ইবনু হারব এবং হিন্দ বিনতু উতবার নামও উল্লেখ করা হয়। সব মিলিয়ে সাত জন। রদিয়াল্লাহু আনহুম। মৃত্যুদণ্ড না পেলেও সফওয়ান ইবনু উমাইয়া, যুহাইর ইবনু আবী উমাইয়া এবং সুহাইল ইবনু আমরসহ অনেকে প্রাণভয়ে লুকিয়ে ছিলেন। পরে তাদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।( রদিয়াল্লহু আনহুম।)

**বিজয়-সালাত**

মধ্যাহ্নের দিকে রাসূল ও তাঁর চাচাতো বোন উম্মু হানি বিনতু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে যান। তিনি সেখানে গোসল সেরে দুই দুই করে মোট আট রাকাআত সালাত আদায় করেন। ] উম্মু হানির দুই মুশরিক দেবর লুকিয়ে ছিল সে ঘরেই। আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) যখন টের পেয়ে গেলেন যে, তার বোন দুই জন মুশরিককে ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখেছে। [ সাথে সাথে তাদের হত্যা করতে উদ্যত হন। উম্মু হানি রেদিয়াল্লাহু আনহা) এসে নবিজি -এর কাছে অনুযোগ করেন। জবাবে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  বলেন, "তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। "

৪৭২] বুখারি, ১৮৩৩। [৪৭৩] বুখারি, ১১০৩।

**কা'বার ছাদে বিলালের আযান**

যুহরের ওয়াক্ত হলে বিলাল  (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডাক দেন নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর কা'বার ছাদে উঠে তাঁকে আযান দেওয়ার আদেশ করেন। কা'বার ছাদ থেকে বিলালের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো আযান। এ তো শুধু সালাতের আহ্বান নয়, ইসলামের প্রতাপ ও বিজয়ের ঘোষণাও বটে। আল্লাহর পবিত্র ঘরে আল্লাহরই বড়ত্ব ঘোষণা হতে শুনে কতই-না শান্তি পেয়েছে মুমিনের কান! আর কতই-না অক্ষম রাগে ফেটে পড়েছে মুশরিকদের হৃদয়! বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ তাআলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

**আনসারদের আশঙ্কা**

মক্কাবিজয় তো সুসম্পন্ন! পরশমণিটিও যদি এখানেই থেকে যায়, তাহলে?

আনসারদের মনে গাঢ় হতে থাকে এই শঙ্কা। হাজার হোক, মক্কাই তো নবিজি -এর পৈত্রিক ভিটে, এখানেই তাঁর গোত্রীয় শেকড়। সাফা পাহাড়ে দুআরত নবিজিকে গিয়ে আনসাররা নিজেদের ভয়ের কথা জানালেন। দুআ শেষে তাদের সেই অলীক ভয় দূর করে দিয়ে নবিজি বললেন, "আল্লাহর পানাহ! আমি তোমাদের সাথেই বাঁচব, তোমাদের সাথেই মরব।" এই কথা শুনে আনসাররা মহাখুশি হয়। তাদের সমস্ত শঙ্কা ও আশঙ্কা দূর হয়ে যায়। হৃদয়-আত্মায় আচ্ছন্ন হয় অভূতপূর্ব এক অনাবিল প্রশান্তি। উনিশ দিন মক্কায় অবস্থান করে রাসূল ও জাহিলিয়াতের প্রতিটি চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেন। মক্কা হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ ও পবিত্র এক ইসলামী শহর। মাসজিদুল হারামের সীমানা নির্দেশ করে কয়েকটি স্তম্ভ গড়ে তোলা হয়। তারপর একজন ঘোষণাকারী সবাইকে জানিয়ে দেন যে, "যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন তার নিজ ঘরে থাকা সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলে।"

## হুনাইনের যুদ্ধ (৮ম হিজরি)

মক্কা বিজয়ের ফলে সেখানকার অধিবাসীরা তো চুপ মেরে গেছে। কিন্তু প্রতিবেশী কিছু গোত্র ইসলামকে শেষ করে দিতে ঠিকই হম্বিতম্বি জারি রাখে। সাকীফ আর হাওয়াযিন গোত্রের সাথে গোপন সলা-পরামর্শ চলে কাইস আইলান-এর। নিজেদের মাঝে তারা বলাবলি করে, "মুহাম্মাদ তো ওর নিজের জাতিকে হারিয়েই দিল। এবার তো যখন-তখন আমাদের ওপর হামলে পড়বে। তাহলে আমরাই আগেভাগে ব্যবস্থা নিচ্ছি না কেন?" যেই কথা সেই কাজ। মালিক ইবনু আওফ নাসরির নেতৃত্বাধীনে তারা এক বিশাল বাহিনী জড়ো করে। হাজির হয় আওতাসে। নারী, শিশু আর গবাদি পশুগুলো পর্যন্ত সাথে করে নিয়ে আসে। যুদ্ধশিল্পে বহু বছরের অভিজ্ঞতাধারী দুরাইদ ইবনুস সিম্মাহ এসে যোগ দেয় হাওয়াযিন বাহিনীতে। সেনাদলের ভেতর উটের ডাক, গাধার রাসভ, ভেড়া-ছাগলের ম্যাঁ ম্যাঁ আর শিশুদের কান্না শুনতে পায় সে। মালিক ইবনু আওফের কাছে সে এর ব্যাখ্যা জানতে চায়।। মালিক জবাব দেয়, প্রতিটি সৈনিকের

পেছনে তার সম্পদ আর পরিবার থাকবে। এতে করে প্রত্যেকেই তাদের রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়াই করবে।

[৪৭৬] বুখারি, ৪২৮০: মুসলিম, ১৭৮০; ইবন হিশাম, ২/৩৮৯, ৪৩৭; যাদুল মাআদ, ২/১৬০-১৬৮/

দুরাইদ বিরোধিতা করে বলে, "আপনি দেখছি জাত রাখাল! মরুচারী বেদুইনকে বাধা দেওয়ার সাধ্য কার? শুনুন! যুদ্ধে জিতলে জিতবেন আপনার ঢাল-তলোয়ার আর নিজের দক্ষতার মাধ্যমে। কিন্তু হারলে হারবেন পুরো পরিবার নিয়ে। এক কাজ করুন, যোদ্ধা ছাড়া বাকি সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিন।" কিন্তু মালিক তাতে অস্বীকৃতি জানায়। নারী, শিশু আর গবাদি পশুগুলোকে সে জড়ো করে আওতাসে। আর সেনাদল নিয়ে এগিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী উপত্যকা হুনাইনে। অপেক্ষায় থাকে হিংস্র আক্রমণের। ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানতে পেরে নবি -ও এগিয়ে চলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। অষ্টম হিজরির ৬ই শাওয়াল শনিবারে মক্কা থেকে বের হয় বারো হাজার সেনা। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার কাছ থেকে এক শ বর্ম অস্ত্রশস্ত্রসহ ধার নিয়েছেন। আর মক্কার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেছেন আত্তাব ইবনু উসাইদ (রদিয়াল্লহু আনহু)-কে। পথে 'যাতুল-আনওয়াত' নামে বড় একটি গাছ রয়েছে। একসময় পৌত্তলিকদের যুদ্ধদেবতার মন্দির ছিল এটি। আরব মুশরিকরা এর ডালে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা এবং গোড়ায় অর্ঘ্য নিবেদন করাসহ আরও অনেক ধর্মীয় আচার পালন করত এখানে। সদ্য ধর্মান্তরিত হওয়া বিশাল জনগোষ্ঠীর অনেকে তখনো ইসলামের চেতনা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। এমনই কয়েকজন এসে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে অনুরোধ করল, "আমাদের জন্যও একটি যাতুল-আনওয়াত বানিয়ে দিন, যেমন তাদের জন্য রয়েছে।" নবি ও সবিস্ময়ে জবাব দিলেন, "আল্লাহু আকবার! তোমরা ঠিক সে-রকম কথাই বলছ মূসার উম্মাত যেমন মূসাকে বলেছিল,

اجْعَلْ لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ

'আমাদের জন্য ওদের দেব-দেবীর মতো একটি উপাস্য বানিয়ে দিন।' মূসা জবাব দিলেন, 'তোমরা হলে মূর্খ সম্প্রদায়!!

সূরা আ'রাফ, ৭: ১৩৮।

আসলে নিশ্চিতভাবে তোমরাও প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের পূর্বেকার জাতিদের অনুসরণ করবে।৪৭৮’

কিছু মুসলিম সেদিন নিজেদের শক্তিমত্তা নিয়েও অতি-আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। কেউ কেউ তো বলেই বসেন, সংখ্যার কারণে আজ তারা পরাজিত হবেন না। নবি ও এহেন দাম্ভিকতায় খুবই রুষ্ট হন।

[৪৭৮] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/২১৮; তিরমিযি, ২১৮০।

সন্ধ্যায় এক অশ্বারোহী এসে খবর দেন যে, হাওয়াযিন তাদের নারী-শিশু-উট- ছাগল সব নিয়ে এসেছে। নবি ও মুচকি হেসে বলেন, "ইনশা আল্লাহ, এই সবকিছু আগামীকাল মুসলিমদের গনীমাতে পরিণত হবে।"[৪৭১]
শাওয়াল মাসের ১০ তারিখে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনে এসে পৌঁছান। ভোরবেলায় উপত্যকায় নেমে আসার আগে সৈন্যদের অবস্থান নির্ধারণ করে দেন। মুহাজির, আওস এবং খাযরাজের পতাকা যথাক্রমে আলি ইবনু আবী তালিব, উসাইদ ইবনু হুদাইর এবং হুবাব ইবনুল মুনযিরের হাতে দেওয়া হয়। প্রতিটি গোত্রের হাতে আলাদা আলাদা পতাকা। নবিজির পরনে ছিল দুটি বর্ম। মুখ ও মাথা ঢেকে রেখেছিল শিরস্ত্রাণ। অগ্রবর্তী দলটি উপত্যকায় নামতে শুরু করে। কিন্তু লুকিয়ে থাকা শত্রু সম্পর্কে তখনো সবাই বেখেয়াল। হঠাৎ করেই পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসে শত্রুসেনাদের অবিরাম তির। মুসলিম সেনাবাহিনী তখনো উপত্যকায় নামতে পারেনি। প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম সারিতে। পড়িমরি করে পেছনে পালাতে থাকে সামনের সেনারা, তা দেখে পেছনের সেনারাও একই কাজ করে। দেখা দেয় প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা। এভাবে পাশার দান উল্টে যাওয়ায় মুশরিকরা তো বটেই, নামমাত্র ইসলামে প্রবেশ করা ব্যক্তিরাও বেশ খুশি হয়ে ওঠে। আবূ সুফইয়ান মন্তব্য করেন, "এরা দেখছি পালাতে পালাতে সাগরে গিয়ে পড়বে!" সাফওয়ানের এক ভাই আনন্দপ্রকাশ করে বলে, "ওদের জাদুটোনা আজ ভেঙে চুরমার।" আরেক ভাইয়ের মন্তব্য, "মুহাম্মাদ আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা হেরে গেছে। তারা আর জীবনেও এক হতে পারবে না।" নিজে মশরিক হওয়া সত্ত্বেও সফওয়ান এবং নতুন মুসলিম ইকরিমা ইবন আবী জাহল তাদের তিরস্কৃত

করেন এবং ধমকি দেন। হাওয়াযিনের কাছে পরাজিত হওয়ার চেয়ে কোনও কুরাইশের কাছে পরাজিত হওয়া ভালো। সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও নবি দৃঢ়পদে যুদ্ধক্ষেত্রে থ যেতে যেতে আবৃত্তি করেন,

[৪৭১] আবূ দাউদ, ২৫০১।

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب

"আমি আল্লাহর নবি, মিথ্যাবাদী নই। আমি আবদুল মুত্তালিবের ছেলে হই।"

আবূ সুফইয়ান ইবনুল হারিস (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবিজির খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন এবং আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) ধরেছিলেন, যেন নবি ও দ্রুত শত্রুর কাছাকাছি চলে না যান। এরপর রাসূল বাহন থেকে নেমে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দুআ করেন। তারপর আব্বাসকে নির্দেশ দেন অন্য সাহাবিদের ডাক দিতে। আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)- এর কণ্ঠস্বর ছিল বেশ চড়া। বাইআতে রিদওয়ানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি উঁচু স্বরে আওয়াজ দেন, "গাছতলার সঙ্গীরা, তোমরা সবাই কোথায়?" যারাই এ ডাক শুনলেন, তারা ফিরে না এসে পারলেন না। জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ! আমরা আসছি।' প্রায় এক শ জন এগিয়ে এলেন আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)- এর কণ্ঠ অনুসরণ করে। সঙ্গ পেয়ে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন করে আক্রমণ করলেন শত্রুদের ওপর। আবারও শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

তারপর আনসার এবং বানুল হারিস ইবনু খাযরাজের উদ্দেশ্যে আরেকটি ডাক দেওয়া হয়। একে একে উপত্যকায় ফিরে আসতে থাকেন মুসলিম সেনা-সারিগুলো। আস্তে আস্তে বেশ বড় একটি জামাআত একত্র হয়ে যায়। [৪৮০] নবি ও মুমিনদের ওপর আসমানি শান্তি নাযিল হয়। নব উদ্যমে উদ্দীপ্ত মুসলিমদের পাশাপাশি লড়াই করতে থাকেন অদৃশ্য এক সেনাবাহিনী। রাসূলুল্লাহ একমুঠো বালু তুলে শত্রুর দিকে ছুড়ে মেরে বলেন, "সবার চেহারা বিকৃত হোক!" আল্লাহ তাআলার নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় এ বালু গিয়ে পড়ে প্রতিটি শত্রুসেনার চোখে। ফলে ঝাপসা চোখে এবার তাদের ছত্রভঙ্গ ও অসহায় হওয়ার পালা। পলায়নপর শত্রুদের ধাওয়া করে মুসলিমরা সহজেই অনেককে হত্যা ও বন্দি করেন। সেই সাথে বন্দি হয় তাদের নারী-শিশুরাও। মুসলিমরা আসার

ঠিক পরপরই আল্লাহ তাদের ঐক্যবদ্ধ করে দেন। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অলোকিক এই বিজয় দেখে ইসলাম গ্রহণ করে মক্কার অনেক মুশরিক।

[৪৮০] বুখারি, ২৮৬৪; মুসলিম, ১৭৭৫।

## হিজরী সন দশম হাজ্জুল ইসলাম বা বিদায় হজ্জ

১০ম হিজরী সনের ২৫ শে যিলকাদা রোজা সোমবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হন। সাহাবীগণের এক বিশাল দল তার সাথী হলেন, যাদের সংখ্যা একলক্ষের চেয়েও বেশী ছিল। মদীনা শরীফ থেকে ছয়মাইল দুরে যুলহুলাইফা নামক স্থানে তিনি ইহরাম বাঁধেন।

৪ঠা যিলহজ্জ শনিবার মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন এবং শরীয়তের নীতি নিয়মানুযায়ী হজ্জব্রত পালন করেন। আরাফাতের ময়দানে বিদায়ী ভাষণ যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরাফাতের ময়দানে তাশরীফ এনে এক বিস্তারিত ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটি ছিল অত্যন্ত নসীহতপূর্ণ ও বিধিবিধান বিষয়ক আল্লাহ তাআলার আখেরী রাসূল (সাঃ) এর আখেরী পয়গাম বিশেষতঃ নিম্ন বর্ণিত বানী সমূহ প্রত্যেক মুসলমানকে তার হৃদয় পটে ক্ষুধিত করে নেয়া দরকার-

হে জনগণ, আমার কথা শোন। আমি সম্ভবতঃ এই স্থানে এ বছরের পর আর কখনো তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারবো না। হে জনতা, আজকের দিনে ও এই মাসে যেমন অন্যের জান মালের ক্ষতি সাধন তোমাদের ওপর হারাম তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম হয়ে গেল। তোমরা শীঘ্রই আল্লাহর কাছে হাযির হবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে। তোমাদের কাছে (আল্লাহর বাণী) পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমি পালন করেছি। যার কাছে কারো গচ্ছিত জিনিস রয়েছে সে যেন মালিকের কাছে তা ফেরত দেয়। সকল সুদ রহিত করা হলো। সব রকমের ঋণ, খুন ও জখমের প্রতিশোধ রহিত করা হয়। তোমরা শুধু মূলধন পাবে। তোমরা কারো ওপর যুলুম করবে না, যুলুমের শিকারও হবে না। আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা যে, কোন সুদ চলবে না। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সমস্ত সুদ রহিত করা হলো।

জাহিলী যুগে সংঘটিত সকল খুন জখমের শাস্তি বা প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র ইবনে রাবীয়ার হত্যার শাস্তি বা প্রতিশোধ রহিত করছি। ইবনে রাবীয়া বনু লাইস গোত্রে দুগ্ধপোষ্য ছিল। বনু হুযাইল তাকে হত্যা করে। সেই হত্যাকাণ্ড দিয়েই আমি জাহিলী যুগের সকল হত্যাকাণ্ড ক্ষমা করার কাজ শুরু করছি। অতঃপর হে জনতা, তোমাদের এই ভূখণ্ডে শয়তানের আর কখনো পূজা অর্চনা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। সে এ ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে। তবে তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে- যাকে তোমরা তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে থাক, শয়তানের আনুগত্য করলে তাতেই সে খুশী হবে। অতএব তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে শয়তান সম্পর্কে সাবধান থেকো হে জনগণ, নিষিদ্ধ মাসগুলোকে পরবর্তী বছরের জন্য মুলতবী রাখা আরো জঘন্য কুফরী কর্ম। কাফিররা এই প্রথা দ্বারা গুমরাহীর পথে চালিত হয়। এর মাধ্যমে তারা রক্তপাতকে এক বছর বৈধ আর এক বছর অবৈধ করে নেয়। এভাবে তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ দিনগুলোকে ফাঁকি দেয়ার চক্রান্ত করে।

এভাবে কার্যতঃ তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজকে বৈধ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বৈধ কাজকে অবৈধ করে নেয়। আকাশ ও পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সময় তার নিজস্ব নিয়মে গড়িয়ে চলেছে। আল্লাহর কাছে মাস হলো বারোটা। তার মধ্যে চারটা হলো নিষিদ্ধ। তিনটা মাস এক নাগাড়ে আর একটা মুদার গোত্রের রজব মাস। সে মাসটা শা'বান ও জামাদিউস্ সানীর মাঝখানে অবস্থিত।

তোমাদের নারীদের প্রতি তোমাদের কিছু কর্তব্য এবং অধিকার রয়েছে। নারীরা তোমাদের বিছানায় অন্য কাউকে শোয়াবে না। এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে না-এটা তাদের কর্তব্য। কেননা এটা তোমাদের ঘৃণার উদ্রেক করে থাকে। আর তা যদি করেই বসে তবে তাদের থেকে আলাদা বিছানায় শোয়া এবং মৃদু প্রহার করার অধিকার আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। তবে যদি পরিশুদ্ধ হয় তাহলে তাদের স্বাভাবিকভাবে খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়া তোমাদের কর্তব্য। নারীদের প্রতি শুভকামী থাক। কেননা তারা তোমাদের কাছে অক্ষম বন্দীস্বরূপ। আল্লাহর আমানত হিসেবে তাদেরকে গ্রহণ করেছো। আল্লাহর বিধান অনুসারেই তোমরা তাদেরকে বৈধ করে নিয়েছো। হে মানব সকল, তোমরা আমার কথা হৃদয়ঙ্গম কর। আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার কাজ আমি সম্পন্ন করেছি। আর তোমাদের কাছে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো বিপথগামী হবে না। প্রকাশ্য সুস্পষ্ট জিনিস আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।

হে জনগণ- আমার কথা শোনো ও হৃদয়ঙ্গম কর। জেনে রাখ, প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। মুসলমানরা ভাই ভাই। কাজেই নিজের ভাইয়ের কোন জিনিস তার খুশী মনে দান করা ছাড়া নেয়া অবৈধ। তোমরা লোকদের ওপর যুলুম করো না।
হে আল্লাহ, আমি কি তোমার দ্বীন মানুষের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি?" লোকেরা বললো, "হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তোমার দ্বীন পৌছিয়ে দিয়েছেন।" তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।"

সীরাতে ইবনে হিসাম

**উসামা ইবনে যায়িদকে ফিলিস্তিনে প্রেরণ**

ইবনে ইসহাক বলেন, উপরোক্ত ভাষণ দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদলবলে মদীনায় ফিরে গেলেন এবং জিলহজ্জের অবশিষ্ট দিনগুলো, মুহাররাম ও সফর মাস সেখানে কাটালেন। তারপর তাঁর আজাদকৃত গোলাম যায়িদের পুত্র উসামার নেতৃত্বে শামে (সিরিয়ায়) একটি বাহিনী পাঠালেন এবং তাকে ফিলিস্তিনের বালকা ও দারুম অঞ্চল অধিকার করার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা সফরের প্রস্তুতি নিল প্রথম হিজরতকারী সকল মুহাজির তাঁর সাথে যাত্রা করলেন।

## রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাত

সফর মাসের শেষ সোমবার। নবি বাকী' গোরস্থানে একজনের জানাযার সালাত পড়েন। ফিরে আসার পর আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বলেন যে, মাথাব্যথা করছে। নবি বলেন, "বরং মাথাব্যথা আমার। উফ, আয়িশা! হায় আমার মাথা! এটা ছিল রাসূল - এর অসুস্থতার সূচনা। স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির কালেও প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে পালাক্রমে থাকতেন নবি ।

একদিন মাইমূনা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে থাকা অবস্থায় জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, "আগামীকাল কার ঘরে থাকব? আগামীকাল কার ঘরে থাকব?" সকল স্ত্রীই বুঝতে পারেন যে, শেষ দিনগুলো তিনি আয়িশার সাথে কাটাতে চাচ্ছেন।( রদিয়াল্লাহু

আনহুন্না।) অনুমতিও দিয়ে দেন সবাই। ফাদল ইবনু আব্বাস ও আলি ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাঁধে ভর দিয়ে নবি * আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে যান।

[৫৪১] বুখারি, ১৩৪৪। [৫৫০] বুখারি, ১৭৪। [৫৫১] বুখারি, ৫৬৬৬। [৫৫২] বুখারি, ৪৪৪২। :

**ওসিয়ত-নসীহত**

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জ্বর বাড়তেই থাকে। একদিন তিনি বলেন, "আমার শরীরে সাত মশক পানি ঢেলে দাও, যেগুলোর বাঁধন খোলা হয়নি। যাতে লোকদের ওসিয়ত করতে পারি।" আমরা হাফসা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর একটি চৌবাচ্চায় বসিয়ে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীরে সেই মশকগুলো থেকে পানি ঢালছিলাম। একসময় তিনি ইশারায় আমাদের থামতে বললেন। তারপর বেরিয়ে গিয়ে সালাতের ইমামতি করেন। সালাত শেষে সবাইকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলেন। সেই বক্তব্যে বলেছিলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবি ও নেককারদের কবরসমূহকে ইবাদাতখানা বানিয়ে নিয়েছিল। খুব ভালো করে শুনে রাখো! তোমরা কবরসমূহকে ইবাদাতখানা বানাবে না। আমি তোমাদের এ থেকে নিষেধ করছি।”

আরও বলেছেন, "ইয়াহুদি ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লা'নত! তারা তাদের নবিদের কবরসমূহকে ইবাদতখানায় পরিণত করেছে।" [৫৫] আরও বলেছেন, "আমার কবরকে তোমরা মূর্তি বানিয়ো না, যার ইবাদাত করা হয়। নবিজি -এর কাছে পাওনা আছে, এমন সবাইকে এসে অধিকার দাবি করতে বলেন তিনি। প্রতিপালকের সাথে দেখা করার আগেই তিনি ঋণমুক্ত হতে চান।

তারপর সাহাবিদের বলেন, "আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুটি জিনিসের যেকোনও একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন-একটি হলো, ইচ্ছামতো এই দুনিয়ার সম্পদ, আরেকটি হলো, আল্লাহর কাছে থাকা সম্পদ। বান্দাটি আল্লাহর কাছে থাকা সম্পদকেই বেছে নিয়েছে।" আবু সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, "এ কথা শুনে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং বলেন, 'আমার পিতা-মাতা

আপনার জন্য কুরবান হোক!" আমরা তাঁর এমন আচরণে অবাক একে অপরকে বলাবলি করলাম, 'কী ব্যাপার? সে ব্যক্তি তো ভালো বস্তু-ই বেছে নিয়েছে। আবু বকর কাঁদে কেন?' কয়দিন পর গিয়ে বুঝলাম যে নবি বান্দা বলতে নিজেকেই বোঝাচ্ছিলেন। (অর্থাৎ তাঁর আসন্ন মৃত্যুর ফলে আমাদের চেয়ে আবু বকরের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বও উপলব্ধি হলো সবার।)

এ ঘটনার পর আবু বকরের সাথে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সখ্য আরও বেড়ে যায়। তিনি তাঁর প্রশংসা করেন এবং মাসজিদের বাকি সব দরজা এখন থেকে বন্ধ করে দিতে বলেন। খোলা রাখতে বলেন শুধু আবু বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘরের সাথে সংযুক্ত দরজাটি। এটি ছিল বুধবারের ঘটনা। পরদিন বৃহস্পতিবার রাসূলুল্লাহ -এর অসুস্থতা আরও বেড়ে যায়। অনেক কষ্টে বলেন, "এসো। আমি তোমাদের একটা জিনিস লিখে দিয়ে যাই, যাতে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট না হও।" উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিপরীতে উপস্থিত সকলকে বলেন নবিজী এখন খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। কুরআন তো আমাদের কাছে আছেই। এটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

" নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পাশে থাকতেই সাহাবিদের মাঝে এ নিয়ে গোলযোগ শুরু হয়ে যায়। নবি আদেশ দিলেন, "আমার নিকট থেকে সবাই উঠে যাও।" সেদিনই রাসূলুল্লাহ এ আদেশ দেন, যাতে সকল ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেওয়া হয়। আরও বলেন যেন মদীনায় আগত সব প্রতিনিধিদলের সাথে ঠিক সেভাবেই উত্তম আচরণ করা হয়, যেভাবে নবি তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। সালাত এবং দাসদের প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব নিয়েও কথা বলেন তিনি।[২] তিনি আরও বলেন, "তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এগুলো আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না-আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবির সুন্নাহ।"
অসুস্থতা সত্ত্বেও এতদিন নবি সালাতে ইমামতি করে এসেছেন। কিন্তু ওই বৃহস্পতিবারে ইশার ওয়াক্তে ব্যতিক্রম ঘটে। ব্যথা কমাতে নবি চৌবাচ্চায় গোসল করে নেন। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। জ্ঞান ফিরে আসার পর গোসল করেন আবারও। এ-রকম তিনবার ঘটে। শেষে তিনি আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে খবর

পাঠান ইমামতি করার জন্য। এই ওয়াক্তের পর থেকে অবশিষ্ট দিনগুলোতে তিনিই ইমামতি করেন।।

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবদ্দশায় এভাবে মোট সতেরো ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি করেন আবূ বকর। শনিবারে কিংবা রবিবারে একটু ভালো বোধ করেন রাসূলুল্লাহ । যুহরের সালাতের জন্য দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে আসেন মাসজিদে। সে সময় আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ইমামতি করছিলেন। নবি গিয়ে তার বামদিকে বসে পড়েন। আবূ বকর নবিজির অনুসরণ করছিলেন আর অন্যান্যরা আবু বকরের অনুসরণ করছিলেন। তিনিই জোরে জোরে তাকবীর বলে সবাইকে অবগত করছিলেন।

২০০১ [৫৬০] বুখারি, ৬৮৭। [৫৬১] বুখারি, ৬৮৭। [৫৬২
] ইবনু সা'দ, তবাকাত, ২/২৩৭-২৩৯। [৫৬৩] বুখারি, ২০৯৬।

**নবিজির যা ছিল সব সদাকা**

রবিবারে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দাসদের মুক্ত করে দেন। সম্পদ বলতে বাকি ছিল মাত্র সাতটি দীনার। সদাকা করে দেন সেগুলোও। অস্ত্রশস্ত্রগুলো মুসলিম সেনাবাহিনীকে দিয়ে দেন। রাত হলে আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এক প্রতিবেশিনীর ঘরে তাঁর প্রদীপটি পাঠান। একটুখানি ঘি ঢেলে দিতে বলেন তাতে। যাতে প্রদীপটি জ্বালাতে পারেন। আর নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বর্মটি এক ইয়াহুদির কাছে বন্ধক ছিল ত্রিশ সা' (প্রায় ৬৬ কেজি) যবের বিনিময়ে।

(রাসুলে আরাবি)

# পবিত্র জীবনের শেষ দিন

আনাস বর্ণনা করেছেন যে, সোমবার দিবস ফজর ওয়াক্তে আবূ বকর-এর ইমামতে সাহাবায়ে কেরাম যখন সালাতরত ছিলেন এমন সময় নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আয়িশাহ-এর ঘরের পর্দা সরিয়ে সালাতরত সাহাবীগণ-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর মৃদু হাসলেন। এদিকে আবূ বাকর (রাঃ) নিজ পায়ের পিছনে ভর দিয়ে পিছনে দিকে সরে গেলেন এবং কাতারে সামিল হলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সালাতে শরীক হওয়ার জন্য ইচ্ছে করছেন। আনাস আরও বর্ণনা করেছেন যে, (হঠাৎ নবী কারীম সম্মুখ ভাগে প্রকাশিত হওয়ায়) সালাতরতগণ এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, সালাতের মধ্যেই একটি পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল (অর্থাৎ নাবী কারীম (সাঃ)-কে তাঁর শারীরিক অবস্থাদি জিজ্ঞাসার জন্য সালাত ভঙ্গ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ হাতের ইশারায় সালাত সম্পূর্ণ করে নিতে বলেন এবং ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে পর্দা নামিয়ে ফেলেন।'

এরপর রাসূলুল্লাহ(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো ওয়াক্ত সালাতের জামাতে শরীক হতে পারেন নি। সকাল গড়িয়ে যখন চাশতের সময় হল তখন নাবী কারীম তাঁর কন্যা ফাতিমাহ-কে ডেকে নিয়ে তাঁর কানে কানে কিছু কথা বললেন। পিতার কথা শুনে কন্যা কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি আবারও কন্যার কানে কানে কিছু কথা বললেন, পিতার কথায় কন্যা এবার হাসতে লাগলেন। 'আয়িশাহ-এর বর্ণনা আছে যে, পরে আমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ফাতৃিমাহ বললেন যে, নাবী কারীম আমাকে প্রথমবার কানে কানে বললেন যে, এ অসুখেই তাঁর ওফাত প্রাপ্তি ঘটবে। এ জন্যেই আমি কাঁদলাম। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে কানে কানে বললেন যে, নাবী কারীম (১)-এর পরিবারবর্গের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমি তাঁর অনুসরণ করব। এ কারণে আমি হাসলাম।

অধিকন্তু নাবী কারীম (সাঃ) ফাতিমাহ-কে এ শুভ সংবাদও প্রদান করেন যে, তুমি হবে মহিলা জগতের নেত্রী। ওই সময় রাসূলুল্লাহ যে কষ্টকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা দেখে ফাতিমাহ কোন চিন্তা ভাবনা না করেই চিৎকার করে উঠলেন- 'হায় আব্বাজানের কষ্ট! নাবী কারীম (সাঃ) বললেন, আজকের পরে তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট নেই।

১.সহীহুল বুখারী

নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে ডেকে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং তাঁদের সম্পর্কে ভাল উপদেশ দিলেন। পবিত্র বিবিগণকে আহ্বান জানালেন এবং ওয়ায ও নসীহত করলেন। এদিকে প্রত্যেক মুহূর্তে রোগ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল এবং সে বিষের প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল যা তাঁকে খায়বারে খাওয়ানো হয়েছিল।

সে সময় তিনি 'আয়িশাহ-কে সম্বোধন করে বললেনহে 'আয়িশাহ! খায়বারে যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম তার যন্ত্রণা এখন আমি সামনে উপলব্ধি করছি। এ মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করছি যে, এ বিষের প্রভাবে আমার শিরা উপশিরাসমূহের জীবন কর্তিত হচ্ছে।' তখন তাঁর চেহারার উপর চাদর ফেলে দেয়া হল। যখন তাঁর পেরেশানী দূর হলো তখন তার চেহারা মোবারক থেকে তা সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, এরূপই হয়।

এটি ছিল তাঁর সর্বশেষ কথা ও মানুষের জন্য অসীয়ত:

তিনি বললেন-

)لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ - يَحْذِرُ مَا صَنَعُوا - لَا يَبْقِيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَب .(

আল্লাহর অভিসম্পাত ইয়াহূদ ও নাসারাদের প্রতি। তারা তাদের নাবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা যা তৈরি করেছে তাথেকে লোকেরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে। আরব ভূখণ্ডে আর কক্ষনো এ দু'টি ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণ-কে উপদেশ প্রদান করে বললেন,

( الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) অর্থ: সালাত, সালাত এবং তোমাদের অধীনস্থ (অর্থাৎ দাসদাসী)। এ শব্দগুলো নাবী কারীম (বারবার পুনরাবৃত্তি করেন।২

২.সহীহুল বুখারী

(আর রাহিকুল মাকতুম)

**অব্যাহত মৃত্যু যন্ত্রণা )الاحْتِضَار(**

অতঃপর শুরু হল মৃত্যু যন্ত্রণা। 'আয়িশাহ নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম )-কে নিজ দেহের উপর ভর করিয়ে থেমে রইলেন। তাঁর এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায়, তিনি বলেছেন, 'আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হচ্ছে নাবী কারীম আমার ঘরে, আমার বিছানায়, আমার গ্রীবা ও বক্ষের মাঝে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'আলা আমার লালা এবং তাঁর লালাকে একত্রিত করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ছিল এ রকম যে, আব্দুর রহমান বিন আবু বাকর  নাবী কারীম-সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করলেন। তাঁর হাতে ছিল মিসওয়াক। রাসূলুল্লাহ আমার শরীরে হেলান অবস্থায় ভর করেছিলেন। আমি দেখলাম যে, নাবী কারীম মিসওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করছেন। অতএব, আমি বুঝে নিলাম যে তিনি মিসওয়াক চাচ্ছেন।

আমি বললাম, 'আপনার জন্য কি মিসওয়াক নিব?' তিনি মাথা নেড়ে তা নেয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর একটি মিসওয়াক নিয়ে নাবী কারীম-কে দিলাম। তিনি ইঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ'। আমি মিসওয়াকখানা নরম করে দিলে খুব সুন্দরভাবে তিনি মিসওয়াক করলেন। সম্মুখেই ছিল পানির পাত্র। পানিতে দু' হাত ডুবিয়ে তিনি মুখমণ্ডল মুছতে মুছতে বলছিলেন, (.. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَات)৩ 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মৃত্যু যন্ত্রণা একটি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

৩.সহীহুল বুখারী

মিসওয়াক থেকে ফারেগ হয়ে রাসূলুল্লাহ) হাত অথবা আঙ্গুল উত্তোলন করলেন এবং ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরলেন। তাঁর ঠোঁট দুটি একটু নড়ে উঠল। 'আয়িশাহ কান পেতে শ্রবণ করলেন, তিনি বলছিলেন

**,مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ الرَّفِيقِ الْأَعْلِي).**

হে আল্লাহ! নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎ ব্যক্তিগণ যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ আমাকে তাদের দলভুক্ত কর এবং আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! আমাকে রফীকে আ'লায় পৌঁছে দাও। হে আল্লাহ! রফীকে আ'লা।'

এ ঘটনা সংঘটিত হয় একাদশ হিজরীর **১২** রবিউল আওয়াল সোমবার সূর্য্যের উত্তপ্ত হওয়ার সময়। সে সময় নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম )-এর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর চার দিন।

**সীমাহীন দুঃখ-বেদনা**

হৃদয় বিদীর্ণকারী এ দুর্ঘটনার সংবাদ তৎক্ষণাত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মদীনাবাসীগণের উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। পৃথিবীর প্রান্ত এবং পার্শ্বস্থ সব কিছুই যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আনাস()-এর বর্ণনা, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ() যেদিন আমাদের নিকট আগমন করেছিলেন সে দিনের মতো উজ্জ্বলতম দিন আর কক্ষনো দেখি নি এবং যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন সে দিনের মতো এত নিকৃষ্ট এবং অন্ধকার দিন আর কক্ষনো দেখি নি।

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুতে ফাত্বিমাহ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, ( يَا أَبَنَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ. يَا أَبَتَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَنَاهُ، إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ) অর্থ: 'হায় আব্বাজান! যিনি আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, হায় আব্বাজান! যাঁর ঠিকানা জান্নাতুল ফিরদাউস, হায় আব্বাজান! আমরা জিবরাঈল আর-কে আপনার মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছি।

(আর রাহিকুল মাকতুম)

**উমার রাঃ এর অবস্থাঃ**

আল্লাহর রাসুলের ইন্তিকালের সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেলে উমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তার হুঁশ বুদ্ধি সাময়িকভাবে লোপ পেয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন, "কিছুসংখ্যক মুনাফিক মনে করছে, আল্লাহর রাসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। বরং তিনি তার রবের নিকটে গিয়েছেন, যেমন মুসা আঃ গিয়েছিলেন। মূসা আঃ তার সম্প্রদায়ের নিকট থেকে চল্লিশ রাত্রি অনুপস্থিত থাকার পর পুনরায় ফিরে এসেছিলেন। অথচ তার ফিরে আসার পূর্বে বলা হতো যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

আল্লাহর কসম, রাসুলুল্লাহ ফিরে আসবেন। আর ঐ সকল লোকের হাত পা কেটে দেবেন, যারা মনে করে যে প্রকৃতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে"।

**আবু বকর রাঃ এর বিচক্ষণ জবাব ও নেতৃত্বঃ**

আল্লাহ রাসুলের ইন্তেকালের খবর পেয়ে আবুবকর নিজ বাড়ি সুনহ থেকে ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে নববীতে আসলেন। এরপর মানুষের সাথে কোনো কথাবার্তা না বলে সরাসরি আয়েশার ঘরে চলে গেলেন। রাসুলের দেহ মোবারক তখনও ইয়ামানী চাদরে ঢাকা ছিল। আবু বকর রাসূলের পবিত্র মুখ থেকে চাদর সরিয়ে তাতে চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। এরপর বললেন, "আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আল্লাহ আপনার জন্য দু'বার মৃত্যু দেবেন না। যে মৃত্যু আপনার ভাগ্যে ছিল তা এসে গেছে"। এরপর তিনি সেখান থেকে বাইরে বের হয়ে আসলেন। হযরত উমার রাঃ সে সময় লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। আবুবকর রাঃ তাকে বললেন, 'উমার, বসো'। কিন্তু উমার রাঃ বসতে অস্বীকার করলেন। এদিকে সাহাবীগণ হযরত উমারকে ছেড়ে দিয়ে আবু বকরের কাছে চলে আসলেন। আবু বকর রাঃ বললেন, "আল্লাহর রাসূলের প্রস্থানের পর তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদের পূজা করছিল, তারা জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করছিল, তারা জেনে রাখুক, আল্লাহ সর্বদা জীবিত। তিনি কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না"।

এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبْتُمْ عَلى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِين َ

অর্থ- আর মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন রসূল ছাড়া আর কিছু নয়।তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতা কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।

(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪৪)

যে সাহাবায়ে কেরাম এতক্ষণ সীমাহীন দুঃখ বেদনায় কাতর হয়ে গিয়েছিলেন, আবু বকরের এই ভাষণ শোনার পর তারা নিশ্চিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ প্রকৃতই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আব্বাস রাঃ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর কসম, এই ব্যাপারটি এমন মনে হচ্ছিল যে, লোকজনেরা যেন জানতোই না যে, আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আবু বকর রাঃ যখন আয়াতটি পাঠ করলেন তখন সকলেই যেন এ সম্পর্কে নতুনভাবে জানলেন'। সকলকে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে দেখা গেল। সাইয়েদ বিন মুসাইব রাঃ বলেছেন, 'উমার রাঃ বলেছেন, আল্লাহর কসম, আমি যখন আবু বকরকে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করতে শুনলাম, তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করলাম। এমনকি আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমার পা উঠানো সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকি আবু বকরকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনে আমি মাটির দিকে গড়িয়ে পড়লাম। কারণ, তখন আমি অনুভব করতে পারলাম যে, রাসূল প্রকৃতই ইন্তেকাল করেছেন'। রাসুল সাঃ এর ইন্তিকালের মুহূর্তে এই আয়াত উপস্থাপন করা আবু বকর সিদ্দিক রাঃ এর বীরত্ব, সাহসিকতা এবং নেতৃত্বগুণের এক অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ। মূলত নেতৃত্বের যোগ্যতা পরীক্ষিত হয় বিপদের মুহূর্তে আর রাসুলের ইন্তেকাল এর চেয়ে ভয়াবহ বিপদ এই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কখনোই আসা সম্ভব নয়। অথচ সেই ভয়াবহ মুহূর্তেও তিনি ছিলেন স্থির ও বলিষ্ঠ। রাসূল সাঃ এর ইন্তিকালের খবরে উসমান রাঃ বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, শোকে স্তব্ধ হয়ে আলী রাঃ আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলেন, উমার রাঃ প্রলাপ বকছিলেন। সবার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছিল। তখন আবু বকর সিদ্দিক রাঃ সবার সামনে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে।

## দাফন-কাফন

মঙ্গলবার রাসূল -এর পবিত্র দেহ কাপড় পরিহিত অবস্থাতেই ধুয়ে দেন আব্বাস, আলি, আব্বাসের দুই ছেলে ফাদল ও কুসাম, নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুক্ত করা দাস শুকরান, উসামা ইবনু যাইদ এবং আওস ইবনু খাওলা (রদিয়াল্লাহু আনহুম)। আব্বাস ও তার ছেলেরা নবিজির দেহ এপাশ-ওপাশ করান। উসামা ও শুকরান পানি ঢালেন। আলি হাত দিয়ে শরীর ধৌত করেন। আর আওস তুলে ধরে রাখতে সাহায্য

করেন নবিজির দেহ। [৫৭৮) পানি ও বরইপাতা দিয়ে তিনবার ধোয়া হয় নবিজির শরীর। কুবায় সা'দ ইবনু খাইসামার একটি কুয়া ছিল 'গারস' নামে। সেখান থেকেই আনা হয় পানি। জীবদ্দশায় নবি এখান থেকে পানি পান করতেন। গোসলের পর তিনটি ইয়েমেনি সুতি কাপড় দিয়ে তাঁর পবিত্র দেহে কাফন পরানো হয়। তাতে জামা এবং পাগড়ি ছিল না।

চাদরে তাঁর শরীর মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে ঠিক যে জায়গায় নবি ও ইন্তিকাল করেন, সেখানেই কবর খোঁড়েন আবূ তালহা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। কবরটি ছিল লাহদ, যার পাশে কুলুঙ্গির মতো থাকে। নবিজি -কে খাটিয়ায় শোয়ানো হয়। সাহাবিরা দশজন দশজন করে এসে ইমাম ছাড়া একাকী সালাতে জানাযা আদায় করেন। প্রথমে নবিজির পরিবারের সদস্যরা, তারপর মুহাজিরগণ, তারপর আনসারগণ, তারপর নারী ও শিশুরা।
মঙ্গলবার সারাদিন এবং বুধবারের রাতের বেশির ভাগ সময় জুড়ে চলতে থাকে জানাযার সালাত আদায়। বুধবার গভীর রাতে সমাধিস্থ হন আল্লাহর রাসূল।

[৫৭৮] বুখারি, ১২৬৪;

রাসুলে আরাবি।

# উম্মুহাতুল মুমিনীনের বিবরণ

**খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ**
খাদিজাই ছিলেন তার প্রথম স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ২০টি বকনা উষ্টি মোহরানা দেন।

তাঁর জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ অন্য কাউকেও বিবাহ করেন নি। নাবী কারীম (সাঃ)-এর সন্তানাদির মধ্যে ইবরাহীম ছাড়া পুত্র কন্যাদের সকলেই খাদীজাহ (রাঃ)এর গর্ভে জন্মলাভ করেন। পুত্র সন্তানগণের মধ্যে কেউই জীবিত ছিলেন না, কিন্তু কন্যা

সন্তানগণ সকলেই জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে, যায়নাব, রুক্কাইয়াহ, উম্মু কুলসুম এবং ফাত্বিমাহ । যায়নাব -এর বিবাহ সম্পন্ন হয় তাঁর ফুফাত ভাই আবুল 'আস বিন রাবী'র সঙ্গে হিজরতের পূর্বে। রুকাইয়াহ এবং উম্মু কুলসুম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (একজনের পর অন্য জন) 'উসমান রাঃ-এর সঙ্গে। ফাতিমাহ-এর বিবাহ সম্পাদিত হয় 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব -এর সঙ্গে বদর এবং উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। ফাত্বিমাহ -এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন হাসান ও হুসাইন আর যায়নাব এবং উম্মু কুলসুম।

## আয়েশা বিনতে আবু বকর ( রাদিয়াল্লাহু আনহা)

মাত্র ৭ বছর বয়সে মক্কায় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে তার বিয়ে হয়। মদিনায় হিজরতের পর নয় বা ১০ বছর বয়সের রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সাথে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেন। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া আর কোনো কুমারী মেয়েকে বিয়ে করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মোহরানা স্বরূপ চারশ দেরহাম প্রদান করেন। আয়িশাহ রাঃ ছিলেন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে প্রিয় পাত্রী অধিকন্তু নাবী পত্নীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী।তিনি ৫৭ বা ৫৮ হিজরীর ১৮ রমজান মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন করা হয়।.

## সাওদা বিনতে  জাময়া রাদিয়াল্লাহু আনহা

খাদীজাহ এর মৃত্যুর কয়েকদিন পর নবুওয়ের দশম বর্ষ শাওয়াল মাসে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওদাহর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মোহরানা সরুপ ৪০০ দিরহাম প্রদান করেন।

## যায়নাব বিনতে জাহাশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মোহরানা দেন ৪০০ দিরহাম। তার পূর্ব স্বামী ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এর আজাদ করা গোলাম যায়িদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু।
যায়নাব সম্পর্কে কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয়, যায়িদ যখন তাকে ছেড়ে দিল তখন আমি তোমার সাথে তাকে বিয়ে দিলাম।

## উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া

তার আর এক নাম হিন্দ। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের ছালভর্তি একটি গাদ,একটি পেয়ালা, একটি প্লেট ও একটি যাতা কল দেন। তার বিয়ে দেন তারই পুত্র সালামা।

## হাফসা বিনতে উমার ইবনুল খাত্তাব

পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে তাকে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সাথে ৪০০ দিরহাম মোহরানায় বিয়ে দেন।

## উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান

তিনি যখন আবিসিনিয়ায় প্রবাসী জীবনযাপন করছিলেন তখন খোদ নাজাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে তাকে ৪০০ দিনার মোহরানা দিয়ে দেন। তার প্রকৃত নাম রমলা।

## জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস

খুযায়া গোত্রের এই মহিলা বনু মুস্তালিক যুদ্ধে যুদ্ধবন্দিনী হয়ে আসেন এবং সাবিত ইবনে কায়সের (রাঃ) অংশে পড়েন। জুয়াইরিয়া হারিসের কাছ থেকে মুক্তিপণের

বিনিময়ে মুক্তিলাভের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। এই মুক্তিপণ প্রদানে সাহায্যের জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুক্তিপণ আদায় করতে রাজী হন এবং তাঁর সাথে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব দেন। জুয়াইরিয়া প্রস্তাবে সম্মত হন। অতঃপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

### সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব রাদিয়াল্লাহু আনহা

ইহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়াকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার থেকে যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে আনেন এবং স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন। এই বিয়েতে তিনি এক অনাড়ম্বর ওলীমার আয়োজন করেন যাতে চর্বি বা গোশতের পরিবর্তে শুধু খোরমা ও ছাতু দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করা হয়। তাঁর পূর্ব স্বামীর নাম কিনানা ইবনে রাবী ইবনে আবুল হুকায়েক।

### মাইমুনা বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বিয়ের আয়োজন করেন। এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে চারশো দিরহাম মোহরানা প্রদান করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনিই সেই মহিলা যিনি পবিত্র কুরআনের ভাষায় নিজেই নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব যখন এই মহিলার নিকট পৌছে তখন তিনি উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। তিনি প্রস্তাবের জবাবে তৎক্ষণাৎ বললেন, "এই উট ও তার আরোহী আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জন্য নিবেদিত।" মহান আল্লাহ এর পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল করেন, "(তোমার জন্য বৈধ করা হয়েছে) যদি কোন মু'মিন রমণী নিজে আত্মনিবেদন করে আর নবী যদি তাকে বিয়ে করতে চান তা হলে।" কেউ কেউ বলেন: নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমর্পণকারিনী মহিলা তিনি নন বরং যায়নাব বিনতে জাহাশ। আবার কেউ বলেন, তিনি উম্মে শুরাইক গাযিয়া বিনতে জাবির। অন্যদের

মতে তিনি বনু সামা গোত্রের জনৈকা মহিলা। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারটি বিলম্বিত করেছেন।

**যায়নাব বিনতে খুযাইমা**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ৪০০ দিরহাম এ বিয়ে হয়। ফকির মিসকিন ও দরিদ্রের প্রতি তার অত্যাধিক দয়া ও মমত্ববোধের কারণে তাকে উম্মুল মাসাটিন বলা হতো।

এই এগারো জন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রী, যাদের সাথে তিনি দাম্পত্য জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা) এবং যায়নাব বিনতে খুযাইমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পূর্বে মারা যান। অবশিষ্ট নয়জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের সময় ও তার পরে জীবিত ছিলেন। এছাড়া দু'জনের সাথে তাঁর দাম্পত্য জীবন যাপন করা সম্ভব হয়নি। একজন আসমা বিনতে নু'মান কিন্দিয়া এই মহিলাকে বিয়ে করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শ্বেত বা কুষ্ঠ আক্রান্ত পান। তাই তাকে উপঢৌকন দিয়ে তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন। অপরজন আমরা বিনতে ইয়াযীদ কিলাবিয়া সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেই তাঁর কাছ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছে এবং আল্লাহর কাছে পানাহ চাইছে।" অতঃপর তাকে তিনি তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফেরত পাঠান।

(ইবনে হিসাম)

# রাসুলুল্লাহ-এর অনুসরণের বিভিন্ন দিক

## সচ্চরিত্রের আদর্শ নমুনা

আল্লাহ তাআলা বলেন: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

সুরা আল-কলাম, ৬৮:৪।

কুরআনই ছিল রাসুলুল্লাহ-এর চরিত্র।২৫

যে বিষয়ে কুরআন সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, তিনিও করতেন আর যে বিষয়ে কুরআন কঠোর হয়েছে, তিনিও হতেন। তিনি স্বভাবগতভাবেই অশালীন ছিলেন না; আবার স্বেচ্ছায়ও অশালীন কথা ও কর্মে লিপ্ত হতেন না। ২৬' হাটবাজারে গিয়ে তিনি কখনো হট্টগোল করতেন না। তিনি অনিষ্টের বদলা অনিষ্ট দিয়ে দিতেন না; বরং অনিষ্টকারীকে অন্তর থেকে মাফ করে দিতেন এবং প্রকাশ্যেও তার প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ করতেন। ২৭'

. ২৫. সহিহু মুসলিম: ৭৪৬। আয়িশা এ থেকে বর্ণিত।

উম্মুল মুমিনিন সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ-এর চেয়ে উত্তম চরিত্রের কাউকে দেখিনি। ২৮' আনাস বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি নয় বছর রাসুলুল্লাহ-এর খিদমত করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে কোনো দিন এমন হয়নি-আমি কোনো কাজ করেছি আর তিনি আমাকে বলেছেন, "এই কাজ কেন করেছ?" কিংবা আমি কাজ করিনি আর তিনি বলেছেন, "এই কাজ কেন করোনি?""২৯ আনাস আরেক হাদিসে বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সর্বোত্তম চরিত্রের ছিলেন। একবার তিনি আমাকে একটি কাজে পাঠান। আমি বলি, আল্লাহর কসম, আমি যাব না। কিন্তু আমার অন্তরে ছিল, রাসুলুল্লাহ যে কাজে আমাকে পাঠান আমি যাব। পরে আমি বের হাঁটতে থাকি। একসময় বাজারে খেলাধুলারত কিছু ছেলেদের পাশ দিয়ে যাই।

হঠাৎ রাসুলুল্লাহ পেছন থেকে আমার ঘাড় ধরেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি হাসছেন। তিনি বলেন: يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُك؟ "আদরের আনাস, আমি যেখানে যেতে বলেছিলাম, তুমি কি সেখানে গিয়েছ?" আমি বলি, "হাঁ, আমি যাচ্ছি হে আল্লাহর রাসুল!""০১

২৮. আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি: ২৫৭৮। ইবনে হাজার বলেন, 'হাদিসটির সনদ হাসান।' (ফাতহুল বারি: ৫৭৫/৬) ২৯. সহিহুল বুখারি: ২৭৬৮, ১.সহিহ মুসলিম: ২৩১০।

**দয়া ও স্নেহে তিনি আদর্শ**

আল্লাহ তাআলা বলেন: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين '

আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।

সুরা আল-আম্বিয়া, ২১: ১০৭।

আবু জার বলেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ রাতে সালাত আদায় করেন। একটি আয়াত পড়ে পড়ে সুদীর্ঘ রুকু এবং সিজদা করেন। এভাবে সকাল হয়ে যায়। আয়াতটি হলো-

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم

আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

সুরা আল-মায়িদা, ৫: ১১৮।

সকাল হলে আমি তাকে বলি, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি তো এই আয়াত পড়ে পড়ে রুকু ও সিজদা করে সকাল করে ফেললেন! তিনি বলেন: إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي

الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي، وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا "আমার উম্মতের জন্য আমার রবের কাছে আমি শাফাআত প্রার্থনা করেছি। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে এই শাফাআতের অধিকারী হবে।"'৩৯

৩৯. মুসনাদু আহমাদ: ২০৮২১। শাইখ শুআইব আরনাউত এ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

মালিক বিন হুওয়াইরিস বলেন, 'একবার আমার গোত্রের একদল লোকের সঙ্গে আমি রাসুলুল্লাহ-এর কাছে আসি। আমরা বিশ রাত তাঁর সাহচর্যে থাকি। তিনি খুবই দয়ালু ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। আমাদের মধ্যে তিনি যখন পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ দেখেন, তখন তিনি বলেন:

ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

তোমরা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে
যাও। তাদের দ্বীন শেখাও। সালাত আদায় কোরো। যখন সালাতের ওয়াক্ত হবে একজন আজান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়সে যে বড় সে ইমামতি করবে।

## বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তিনি আদর্শ

আয়িশা বলেন, 'রাসুলুল্লাহ-এর কোনো সহধর্মিণীর প্রতি আমি অতটা ঈর্ষা বোধ করিনি, যতটা খাদিজার প্রতি করেছি; অথচ তাঁকে আমি দেখিনি। কিন্তু রাসুলুল্লাহ তাঁর কথা প্রায়শ বলতেন। কখনো বকরি জবাই করে বিভিন্ন অংশে ভাগ করতেন। তারপর খাদিজার বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। আমি প্রায়ই বলতাম, দুনিয়াতে খাদিজা ছাড়া আর কোনো মেয়ে নেই বুঝি! তিনি খাদিজার প্রশংসা কর إِنَّهَا: ে " وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ ،كَانَتْ، وَكَانَتْওএমন ছিল... এমন ছিল... ওর গর্ভেই আমার সন্তান হয়েছে বলতেন।""৪২

৪১. সহিহুল বুখারি: ৬২৮, সহিহু মুসলিম ৬৭৪। ৪২. সহিহুল বুখারি: ৩৮১৮, সহিহু মুসলিম: ২৪৩৫।

## বিনয় ও নম্রতায় তিনি আদর্শ

আল্লাহ তাআলা বলেন: َوَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِين

(সুরা আশ-শুআরা ২৬)

আর যেসব মুমিন তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি বিনয়ী হও। 'অর্থাৎ তাদের প্রতি অমায়িক আচরণ করুন এবং নম্রতা প্রদর্শন করুন।
আল্লাহ তাআলা রাসুল-কে গরিব মুমিন ও অন্যদের সঙ্গে বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাদের সালাম দিতেন। একজন সামান্য দাসীও তাঁর হাত ধরে তাঁকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। তিনি নিজ হাতে জুতো সেলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন। ছাগলের দুধ দোহন করতেন।৪৮' ফকির-মিসকিনদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতেন। গরিব ও এতিমদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে চলাফেরা করতেন। কেউ তাঁকে ডাকলে নির্দ্বিধায় সাড়া দিতেন-তা যত তুচ্ছ কাজে হোক না কেন। তিনি অসসুস্থদের খোঁজখবর করতেন। জানাজায় হাজির হতেন।

## বীরত্বে তিনি আদর্শ

আলি (রাঃ) বলেন, 'বদরের দিন যখন যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করল, আমরা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে আশ্রয় নিলাম। সেদিন তিনিই ছিলেন আমাদের মাঝে সবচেয়ে তীব্র আক্রমণকারী এবং তিনিই ছিলেন মুশরিকদের সবচেয়ে নিকটে।

(মুসনাদে আহমাদ)

বারা বিন আজিব বলেন, 'যখন যুদ্ধের প্রচণ্ডতা চলে আসত, আমরা রাসুল -এর পেছনে আত্মরক্ষা করতাম। আর আমাদের মাঝে তারাই ছিল বীর, যারা তাঁর সাথে সামনে এগিয়ে যেতেন। '৫৩ আনাস বিন মালিক বলেন, 'রাসুল ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর। সবচেয়ে বেশি মহানুভব। সবার চেয়ে বেশি বীরত্বের অধিকারী। একরাতে মদীনাবাসী বিকট একটি আওয়াজ শুনল। সবাই আওয়াজের উৎসের দিকে দৌড়াতে লাগল।

পথেই রাসুল তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তিনি তখন ওদিক থেকে ফিরছিলেন, সবার আগেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তখন তিনি আবু তালহার পালানবিহীন একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাঁর ঘাড়ে তলোয়ার। তিনি বলছিলেন, "ভয়ের কিছু নেই। তোমরা নির্ভয় হও।" এরপর বললেন, "এ ঘোড়াটিকে আমি সাগরের (স্রোতের) মতো গতিশীল পেয়েছি।" অথচ স্বাভাবিকভাবে ঘোড়াটির গতি ছিল ধীর। '৫৪ এটি নবিজি-এর একটি মুজিজা। স্বাভাবিকভাবে ঘোড়াটি ধীরগতির হলেও তিনি চড়ার পর সেটি দ্রুতগামী হয়ে গেল। এমনকি সমুদ্রের স্রোতের চেয়েও দ্রুত চলতে লাগল। যে ঘোড়াটি সবার পেছনে থাকত, সে ঘোড়ায় চড়েই রাসুল সবার আগে, সবার অগোচরে সবকিছু যাচাই করলেন-আবার ফিরেও এলেন।
(সহিহ বুখারী ২৯০৮)

**দান ও মহানুভবতায় তিনি আদর্শ**

ইবনে আব্বাস বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ছিলেন সর্বাধিক দানশীল। রমাজান মাসে তাঁর দানশীলতা অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেড়ে যেত। তখন জিবরাইল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর জিবরাইল 'রমাজান মাসের প্রত্যেক রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁরা একে অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। রাসুল ছিলেন প্রবহমান বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল।'৫৫

৫৩. সহিহু মুসলিম: ১৭৭৬। ৫৪. সহিহুল বুখারি: ২৯০৮, সহিহু মুসলিম: ২৩০৭। ৫৫. সহিহুল বুখারি: ৬, সহিহু মুসলিম ২৩০৮।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন, 'নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো না বলতেন না।১০৬' আনাস বিন মালিক বলেন, 'ইসলামের নাম করে রাসুল-এর নিকট কিছু চাওয়া হলেই তিনি দিয়ে দিতেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আসলো। দুপাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান ভরে যায়-এ পরিমাণ ছাগল তিনি তাকে দান করলেন। সে তার কওমের নিকট ফিরে গিয়ে বলল, "হে আমার গোত্র, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। মুহাম্মাদ এত বেশি দান করেন যে, তাঁর অভাবের কোনো ভয় নেই।""৫৭

## আল্লাহভীতিতে তিনি আদর্শ

মুতাররিফ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি রাসুল-কে দেখলাম, তিনি নামাজ পড়ছেন আর তাঁর সিনা থেকে জাঁতা পেষার শব্দের মতো কান্নার আওয়াজ আসছে। '৫৮ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, 'আবু বকর আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন!" রাসুল বলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, উত্তর দিলেন, "আমাকে হুদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতা সা-আলুন এবং ইযাশ শামছু কুওয়্যিরাত বুড়ো বানিয়ে ফেলেছে।""৫৯ (অর্থাৎ এসব সুরায় বর্ণিত কিয়ামত ও আজাবের আলোচনা আমাকে বুড়ো বানিয়ে ফেলেছে।)

## দুনিয়াবিমুখতায় তিনি আদর্শ

একবার উমর রাসুল-এর নিকট আসেন। তিনি তখন চাটাইয়ের ওপর শায়িত। তাঁর শরীর ও চাটাইয়ের মাঝখানে কিছুই ছিল না। মাথার নিচে আঁশভর্তি চামড়ার একটি বালিশ। মাথার কাছে ঝুলছে কয়েকটি কাঁচা চামড়া। উমর বলেন, 'আমি দেখলাম, তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে।

৫৬. সহিহুল বুখারি: ৬০৩৪, সহিহু মুসলিম: ২৩১১। ৫৭. সহিহু মুসলিম: ৩৩১২। ৫৮. সুনানু আবি দাউদ: ৯০৪। হাদিসের মান: সহিহ। ৫৯. সুনানুত তিরমিজি: ৩২১৯। হাদিসের মান: সহিহ।

এ অবস্থা দেখে আমি কেঁদে ফেললাম।' রাসুল বলেন, 'কাঁদছ কেন?' আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসুল, কাইসার ও কিসরা কত আরামে আছে! অথচ আপনি আল্লাহর রাসুল।' তিনি বললেন, 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া এবং আমাদের জন্য আখিরাত! '৬০ যখন তিনি সাহাবিদের দুনিয়া ত্যাগের প্রতি উৎসাহিত করছেন এবং আখিরাতের সাথে সম্পর্ক গড়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করছেন, তখনও তিনি হজ করছিলেন (উটের পিঠে) একটি পুরাতন জিন ও পালানে বসে; পশমি একটি চাদর ছিল তাঁর গায়ে, যার মূল্য চার দিরহামের মতো। ৬১

**আল্লাহর ওয়াদার ওপর অবিচলতায় তিনি আদর্শ**

ইসহাক বর্ণনা করেন, বারা-কে জনৈক ব্যক্তি বলে, 'হে আবু আম্মারাহ, আপনারা হুনাইনের দিন পলায়ন করেছিলেন!' বারা উত্তর দেন, 'না। আল্লাহর শপথ, নবিজি পলায়ন করেননি। বরং প্রথম সারির লোকেরা পলায়ন করেছিল। হাওয়াজিনের তিরসমূহ পাকড়াও করেছিল তাদের। রাসুলুল্লাহ তখন তাঁর সাদা খচ্চরের ওপরে ছিলেন, যার লাগাম ছিল আবু সুফইয়ান বিন হারিস-এর হাতে। নবিজি আবৃত্তি করছিলেন: ُأَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ "নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর নবি। আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান আমি।""৬২

**সবর ও ক্ষমায় তিনি আদর্শ**

তাওরাতে তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, 'তিনি রূঢ় নন-কঠোর নন। তিনি বাজারে বাজারে উচ্চস্বরে হইচইকারী নন। তিনি মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করেন না। বরং ক্ষমা ও মার্জনা করেন।

'৬৩ ৬০. সহিহুল বুখারি: ৪৯১৩, ৫৮৪৩; সহিহু মুসলিম: ১৪৭৯। ৬১. সুনানু ইবনি মাজাহ: ২৮৯০। আনাস ২১ থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান: সহিহ। ৬২. সহিহুল বুখারি: ২৮৬৪, সহিহু মুসলিম: ১৭৭৬। ৬৩. সহিহুল বুখারি: ২১২৫। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস এ থেকে বর্ণিত।

**তাওবা ও ইসতিগফারে আদর্শ**

তিনি আবু হুরাইরা বলেন, 'রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহর শপথ, আমি দিনে সত্তরবারেরও অধিক তাওবা করে থাকি। "'৬৪

## ইবাদতে তিনি আদর্শ

আয়িশা বলেন, 'নবিজি রাত জেগে এত বেশি নামাজ পড়তেন যে তাঁর তাঁকে বলতেন, 'আপনি কেন এমন করেন হে পা ফুলে যেত।' আয়িশা বলেন,হে আল্লাহর রাসুল? আপনার তো আগে-পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।' তিনি বলতেন, 'আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চাইব না!'৬৫

উবাইদ বিন উমাইর হতে বর্ণিত আছে, একবার তিনি আয়িশা-কে বলেন, 'রাসুল-এর কোন বিষয়টি আপনার সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য লেগেছে?' এই প্রশ্ন শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, 'এক রাতে তিনি আমাকে বললেন, "হে আয়িশা, আমাকে ছাড়ো। এ রাতে আমি আল্লাহর ইবাদত করব।" আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ, আমি আপনার নৈকট্য ভালোবাসি এবং ওই জিনিসকেও ভালোবাসি, যা আপনাকে আনন্দিত করে।" তারপর তিনি উঠে পবিত্র হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাজে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চিবুক ভিজে গেল। তিনি কাঁদতে থাকলেন। একসময় তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। তিনি আরও কাঁদতে লাগলেন। এমনকি একসময় মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। তারপর বিলাল ফজরের আজান দিতে এলেন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কাঁদতে দেখে বিলাল বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার তো আগে-পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।" তিনি বললেন, "আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? আজ রাতে আমার ওপর একটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যে এ আয়াত তিলাওয়াত করল, কিন্তু এর মর্ম নিয়ে চিন্তা করল না, তার জন্য ধ্বংস। إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

৬৪. সহিহুল বুখারি: ৬৩০৭। ৬৫. সহিহুল বুখারি: ৪৮৩৭, সহিহু মুসলিম: ২৮২০। "

নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য।

(সুরা আলে ইমরান : ১৯০)

রমাজান এলে তাঁর নিয়ম ছিল ইবাদতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। এই মাসে তিনি অধিক পরিমাণে সাদাকা করতেন। অধিক তিলাওয়াত, সালাত, জিকির ও ইতিকাফ করতেন।

**নফল আমল**

কখনো তিনি এত অধিক পরিমাণে নফল সাওম পালন করতে থাকতেন যে, সাহাবিরা বলাবলি করতেন, তিনি মনে হয় আর কোনো দিন সাওম ছাড়বেন না। আবার কখনো তিনি এত দীর্ঘ সময় ধরে নফল সাওম তরক করতেন যে, বলা হতো, তিনি মনে হয় আর নফল সাওম পালন করবেন না। রমাজান ব্যতীত কখনো পূর্ণ মাস রোজা রাখতেন না তিনি। অন্য মাসগুলোর তুলনায় শাবান মাসে বেশি রোজা রাখতেন। ৬৭' সর্বদা সোমবার ও বৃহস্পতিবারে নফল সাওম পালন করতেন। ৬৮

**কুরআন তিলাওয়াত**

তারতিলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তিনি। বেশি জোরেও নয় আবার একেবারে ধীরেও নয়। বরং প্রতিটি অক্ষর স্পষ্ট করে পড়তেন। প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথক করে তিলাওয়াত করতেন। মাদের হরফ টেনে পড়তেন। )اَلرَّحْمٰن( আর-রাহমান টান দিয়ে পড়তেন।()اَلرَّحِيم) আর-রাহীম টান দিয়ে পড়তেন। ৬৯ 'তিলাওয়াত শুরুর আগে তিনি()أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم)পাঠ করতেন।

৬৬. সহিহু ইবনি হিব্বান ৬২০। হাদিসের মান: হাসান। ৬৭. সহিহুল বুখারি: ১৬৬৯, সহিহ মুসলিম: ১১৫৬। ৬৮. সুনানুত তিরমিজি: ৭৪৫, সুনানুন নাসায়ি ২৩৬১, সুনানু ইবনি মাজাহ: ১৭৩৯। আয়িশা থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান: সহিহ। ৬৯. সহিহুল বুখারি: ৫০৪৬।

তাঁর নির্দিষ্ট একটি হিজব" ছিল। যা তিনি নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, অজু অবস্থায় এমনকি অজু না থাকা অবস্থায়ও তিনি কুরআন তিলাওয়াত

করতেন। কেবল গোসল ফরজ হলেই কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকতেন। ৭২’

## আল্লাহর জিকিরে তিনি আদর্শ

সৃষ্টিজগতের মধ্যে তিনিই পূর্ণাঙ্গ জিকিরকারী ছিলেন। সর্বদা তিনি আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন। বসে, দাঁড়িয়ে, হাঁটতে হাঁটতে, আরোহী অবস্থায়, ভ্রমণকালে, যাত্রাবিরতিতে-এককথায় তাঁর কোনো সময়ই জিকির ছাড়া কাটত না।

## সালাত, সাওম ও বিবাহে রাসুল(-সাঃ)এর অনুসরণের আহ্বান

আনাস বিন মালিক বলেন, 'রাসুলুল্লাহ(সাঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জানতে তিনজন সাহাবি তাঁর স্ত্রীগণের ঘরে এলেন। তাদের যখন এ বিষয়ে জানানো হলো, তারা এটিকে কেমন যেন কম মনে করলেন। তারা বললেন, "কোথায় নবি আর কোথায় আমরা! তাঁর তো পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।” তাদের একজন বললেন, "আমি এখন থেকে নিয়মিত সারা রাত নামাজ পড়ব।" আরেকজন বললেন, "আমি এখন থেকে টানা রোজা রাখব, কখনো রোজা ছাড়ব না।" তৃতীয় জন বললেন, "আমি নারী থেকে দূরে থাকব। কখনো বিবাহ করব না।" তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এলেন। তাদের বললেন, "তোমরাই কি এমন এমন কথা বলেছিলে? আরে তোমাদের চেয়ে তো আমিই আল্লাহকে বেশি ভয় করি। তোমাদের তুলনায় আমি অনেক বেশি তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু তবুও আমি কখনো রোজা রাখি, কখনো ছাড়ি। কখনো নামাজ পড়ি, কখনো বিশ্রাম নিই। নারীদের বিবাহও করি। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয়, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।"'৭৩

## হজের ক্ষেত্রে তিনি আদর্শ

যেসব ইবাদতে রাসুলুল্লাহ-এর আনুগত্য ও অনুসরণের ছাপ সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, সেগুলোর অন্যতম হলো হজ। হজের ব্যাপারে নবিজি তাঁর আনুগত্যের আদেশ দিয়ে

বলেন, 'তোমরা (আমাকে দেখে) হজের নিয়মকানুন শিখে নাও। জানি না, এই হজের পরে আমি আর হজ করতে পারব কি না। '৭৫ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কেবল অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করলেই যথেষ্ট হবে না; বরং তাঁর আনুগত্যের পরিধি আরও ব্যাপক যা তাঁর জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে ধারণ করে। এ ব্যাপারে তাঁর অনুসৃত জীবনপদ্ধতিই মুমিনের জন্য অনুসরণীয়, যা বিশুদ্ধতায় পরিপূর্ণতাকে স্পর্শ করতে পেরেছে।

৭৩. সহিহুল বুখারি: ৫০৬৩, সহিহু মুসলিম: ১৪০১। ৭৪. ফাতহুল বারি: ৯/১০৬। ৭৫. সহিহু মুসলিম: ১২৯৭।

খাবার ও পানীয়ের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ছিল, তিনি উপস্থিত খাবার ফিরিয়ে দিতেন না। অন্য খাবার আনতে বলতেন না। কোনো হালাল খাদ্য পেশ করা হলেই খেয়ে নিতেন। কখনো খাবারের দোষত্রুটি বের করতেন না। মন চাইলে খেতেন, নইলে বিরত থাকতেন।  এক চাঁদ গিয়ে আরেক চাঁদ আসে। সেটি চলে গিয়ে তৃতীয় চাঁদও উদিত হয় আকাশে। অথচ তাঁর ঘরে চুলোয় আগুন জ্বলে না। খাবার রান্নার কোনো আয়োজন হয় না।" যখন তাঁর সামনে খাবার পরিবেশন করা হতো, বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতেন। খাওয়া শেষে বলতেন: اللهمَّ أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ، وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ، وَأَحْيَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ '

হে আল্লাহ, আপনি (আমাকে) আহার করালেন, আপনি পান করালেন, আপনি অভাবমুক্ত করেছেন, আপনি সম্পদশালী করেছেন, আপনি পথ দেখালেন, আপনি জীবন দান করেছেন। আপনি যা দান করেছেন, তার জন্য আপনারই প্রশংসা (আদায় করছি)।'

'কারও বাড়িতে মেহমান হলে পানাহার শেষে মেজবানের জন্য দোয়া না করে সেখান থেকে বের হতেন না।' যখন যা মিলত, তা-ই খেতেন। খাবারের ব্যবস্থা না থাকলে, সবর করতেন। কখনো ক্ষুধার তীব্রতায় পেটে পাথর বাঁধতেন। ছোট হোক বা বড়, আজাদ হোক বা গোলাম, মুহাজির হোক বা গেঁয়ো-কেউ খাওয়াতে চাইলে তিনি অবজ্ঞা করতেন না।

(মুসনাদে আহমাদ)

## উচ্চারণে, মৌনতায়, হাসি-কান্নায় তিনি আদর্শ

কথা বলতেন সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায়। কেউ চাইলে শব্দগুলো অনায়াসে গুনে ফেলতে পারবে। এত দ্রুত বলতেন না, যাতে শ্রোতার মনে রাখতে কষ্ট হয়। আবার এত আস্তেও বলতেন না, যাতে কথার মাঝে অসংখ্য বিরক্তিকর ছেদ পড়ে। বরং তাঁর বাকরীতি ছিল পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বোঝার সুবিধার্থে তিনি একই কথা তিনবার বলতেন। সালাম করলেও তিনবার করতেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে মৌনতা অবলম্বন করতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। কথা বলতেন জাওয়ামিউল কালিম তথা সর্বমর্মী ও সারগর্ভ ভাষায়।

. সুনানুত তিরমিজি: ৩৩৯৮। হুজাইফা বিন ইয়ামান এ থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান: সহিহ। , জাদুল মাআদ ১/১৫৫ ও ৪/২৪৬।  সহিহুল বুখারি: আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত।

পরিমিত বাক্যে-বেশিও নয়, আবার কমও নয়। অর্থহীন কোনো বিষয়ে তিনি মুখ খুলতেন না। কেবল তা-ই বলতেন, যার দ্বারা তিনি সাওয়াবের আশা করতেন। যখন কোনো কিছু তাঁর অপছন্দ হতো, তাঁর চেহারা দেখেই তা বোঝা যেত। তাঁর অধিকাংশ হাসিই ছিল মুচকি হাসি। বরং কেবল মুচকি হাসিই তিনি হাসতেন। সর্বোচ্চ এতটুকু হাসতেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত দেখা যেত। হাসির কথায় কিংবা অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনক কথায় তিনি হাসতেন। ৮৪
তাঁর কান্না ছিল হাসির মতোই মৌন। শব্দ নেই, আওয়াজ নেই। অট্টহাসি কিংবা ফুঁপিয়ে কান্না দুটো থেকেই তিনি ছিলেন অনেক দূরে। তবে তাঁর চোখের ধারা বেয়ে অশ্রু গড়াত। সিনা থেকে জাঁতা পেষার শব্দের মতো মৃদু কান্নার আওয়াজ পাওয়া যেত। কখনো তিনি কাঁদতেন মৃতের প্রতি অন্তহীন করুণায়। কখনো উম্মতের কল্যাণচিন্তায় কিংবা সুগভীর মায়ায়। কখনো কাঁদতেন আল্লাহর ভয়ে। কুরআন তিলাওয়াত শোনার সময়ও কাঁদতেন তিনি। শঙ্কা ও ভয়ের পাশাপাশি কালামুল্লাহর প্রতি অত্যধিক অনুরাগ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের কারণে তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারতেন না। আদরের সন্তান ইবরাহিমের মৃত্যুতে তিনি বারবার

কেঁদেছিলেন। এটি ছিল পুত্রের প্রতি হৃদয়ে সঞ্চিত রহমতের বহিঃপ্রকাশ। আপন এক নাতনির মুমূর্ষু অবস্থা দেখেও তাঁর চোখে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল। ৮৫

**বক্তৃতায় তিনি আদর্শ**

যখন তিনি বক্তৃতা দিতেন, তাঁর চোখদুটি লাল হয়ে উঠত। স্বর উঁচু হয়ে যেত। তাঁর ক্রোধ প্রবল আকার ধারণ করত। অবস্থা এমন হতো যেন তিনি কোনো সৈন্যদলকে হুঁশিয়ার করছেন। তিনি আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা না করে বক্তৃতা শুরু করতেন না। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু ছিল আল্লাহর হামদ, নিয়ামতের প্রশংসা, আল্লাহর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য, ইসলামের আহকাম, আখিরাতের কথা, জান্নাত- জাহান্নাম, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণ ইত্যাদি। শ্রোতাদের কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই তিনি বক্তব্য রাখতেন। মানুষের অবস্থার দিকে লক্ষ করে কখনো বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতেন-কখনো দীর্ঘ করতেন।৮৮

**লেনদেনে তিনি আদর্শ**

লেনদেনের বিচারে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর মানুষ। তিনি বেচাকেনা করেছেন, সরঞ্জাম ভাড়া নিয়েছেন, ভাড়ায় খাটিয়েছেন, অন্যের ব্যবসায় অংশীদারও হয়েছেন। পূর্বের কোনো ব্যবসার অংশীদার তাঁর কাছে এলে তিনি বলতেন, 'আপনি আমাকে চেনেন না?' অংশীদার লোকটি বলত, 'আপনি আমার ব্যবসার অংশীদার ছিলেন না? কত উত্তম অংশীদার ছিলেন আপনি! আমাকে না কখনো ঠকাতেন, না বিবাদ করতেন!'৮৯

৮৭. জাদুল মাআদ: ১/১৮৩। ৮৮. জাদুল মাআদ: ১/১৯১। ৮৯. সুনানু আবি দাউদ: ৪৮৩৬, সুনানু ইবনি মাজাহ: ২২৮৭। হাদিসের মান: সহিহ।

তিনি হাদিয়া দিতেন। হাদিয়া কবুল করতেন। হাদিয়ার প্রতিদান দিতেন। কোনো কিছু বন্ধক রেখে ধার নিতেন। আবার বন্ধক না রেখেও ধার নিতেন। অন্যের কাছে সরঞ্জাম ধার চাইতেন। নগদে ও বাকিতে ক্রয় করতেন। যখন কেউ তাঁর কাছ থেকে

ধার চাইতেন, তাকে তার চাওয়া থেকে উত্তম কিছু দিতেন। যখন তিনি কারও কাছ থেকে ধার নিতেন, ঠিকমতো পরিশোধ করতেন এবং তার জন্য এই বলে দোয়া করতেন- بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاء 'আল্লাহ তোমার পরিবার-পরিজনে এবং সম্পদে বরকত দান করুন। কর্জের বিনিময় তো এই যে, কর্জদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কর্জ আদায় করা। '৯০ রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মালিকানাধীন ভূমিতে অবস্থান করতেন। তিনি তা আল্লাহর রাস্তায় সাদাকা করে দিয়েছিলেন। তিনি অপরের জন্য সুপারিশ করতেন। তাঁর কাছেও সুপারিশ করা হতো। রাসুলুল্লাহ মহিলা সাহাবি বারিরা -কে সুপারিশ করেছিলেন, তিনি যেন মুগিস রাঃ-কে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। বারিরা তাঁর সুপারিশ গ্রহণ না করে মুগিস-কে ফিরিয়ে দেন। এতে তিনি বারিরার প্রতি মোটেও রাগান্বিত হননি। তাকে তিরস্কারও করেননি। রাসুল হলেন আদর্শ ও দৃষ্টান্ত।

রাসুল ৮০টিরও অধিক বিষয়ে কসম খেয়েছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে ৩টি বিষয়ে কসম করার আদেশ দিয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ অনেক সময় ইনশাআল্লাহ-সহযোগে কসম করতেন। তিনি কসম পূর্ণ করতেন। কসমের কাফফারা দিতেন। তিনি মজা করতেন। তবে মজা করতে গিয়ে মিথ্যা বলতেন না। তিনি তাওরিয়া বা দ্ব্যর্থবোধক বাক্য বলে কৌতুক করতেন। তবে মিথ্যা বলতেন না। দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। কুস্তি লড়তেন।

৯০. সুনানুন নাসায়ি: ৪৬৮৩, সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪২৪২। হাদিসের মান: সহিহ।

নিজ হাতে জুতো সেলাই করতেন। নিজ হাতে জামার তালি লাগাতেন। নিজ হাতেই চামড়ার বালতি মেরামত করতেন। ছাগলের দুধ দোহন করতেন, কাপড় কাচতেন, পরিবারের সেবা করতেন। মসজিদ নির্মাণের সময় সাহাবিদের সঙ্গে ইট বহন করতেন। তিনি মেহমান হতেন। মেজবানও হতেন। রোগীদের সেবা করতেন। জানাজায় উপস্থিত হতেন। খাওয়ার দাওয়াতে যেতেন। বিধবা, মিসকিন ও দুর্বলদের অভাব মোচন করতেন। কবিদের প্রশংসাব্যঞ্জক কবিতা শুনতেন এবং তাদের পুরস্কৃত করতেন।

## রোগীর সেবায় তিনি আদর্শ

সাহাবিদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি দেখতে যেতেন। সেবা করতেন। জনৈক ইহুদি গোলাম তাঁর সেবা করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার সেবা করতেন। চাচা অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি চাচারও সেবা কর তিনি ছিলেন মুশরিক। উভয়ের নিকট তিনি ইসলাম পেশ করে গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু চাচা ইসলাম কবুল করেননি।

তিনি রোগীর কাছে যেতেন। মাথার পাশে বসতেন। অবস্থা জানতে চাইতেন। বলতেন, 'কেমন বোধ করছ?' ডান হাতখানি শরীরে বুলিয়ে দিতেন এবং বলতেন: 'اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ وَاشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا
হে আল্লাহ, মানুষের প্রভু, কষ্ট দূর করুন, সুস্থ করে দিন। আপনিই আরোগ্যদানকারী। আপনি ছাড়া কেউই রোগমুক্ত করতে পারে না। এমনভাবে আরোগ্য দান করুন, যার পরে কোনো রোগ অবশিষ্ট থাকে না। '৯১

৯১. জাদুল মাআদ: ১/৪৯৪।

## স্বভাবজাত রীতিনীতিতেও তিনি আদর্শ

জুতো পরা, চুল আঁচড়ানো, পবিত্র হওয়া, গ্রহণ করা, প্রদান করা ইত্যাদি কাজে তিনি ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। খাওয়া, পান করা, পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে ডান হাতকে প্রাধান্য দিতেন। আর শৌচকার্যে এবং বিভিন্ন কষ্টদায়ক বস্তু সরাতে তিনি বাম হাত ব্যবহার করতেন। মাথা কামানোর ক্ষেত্রে তাঁর নিয়ম ছিল, হয় মাথার সবগুলো চুল রাখতেন নতুবা পুরোটা কামাতেন বা ছাঁটতেন। কিছু অংশ কামিয়ে বাকিটা ছেড়ে দেওয়া কিংবা কোথাও ছেঁটে ছোট করে, কোথাও বড় করে রাখা-এমনটা করতেন না। মিসওয়াক করতে ভালোবাসতেন তিনি। সাওম অবস্থায় মিসওয়াক করতেন। সাওম না থাকা অবস্থায়ও মিসওয়াক করতেন। ঘুম থেকে জাগার পর মিসওয়াক করতেন। অজু করার সময় মিসওয়াক করতেন। নামাজের সময় মিসওয়াক করতেন। এমনকি বাড়িতে প্রবেশ করার সময়ও মিসওয়াক

করতেন। তিনি অধিক সুগন্ধি লাগাতেন। সুগন্ধি ভালোবাসতেন। সুগন্ধি হাদিয়া এলে ফিরিয়ে দিতেন না। তিনি চুল পরিপাটি রাখতে পছন্দ করতেন। কখনো নিজে চুল আঁচড়াতেন। কখনো আম্মাজান আয়িশা আঁচড়ে দিতেন। মুসলিমদের আপন আপন অবস্থার প্রতি নজর দেওয়া উচিত। তারা যেন রাসুলুল্লাহ এবং তাঁর সাহাবিদের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তথাকথিত কোনো তারকা, অভিনেতা, অভিনেত্রী কিংবা পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের মডেল হিসেবে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ মুসলমানদের নেই।

## শারীরিক গঠন ও অনুপম আখলাক

আলী (রাযি.)রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর  শারীরিক গঠন ও অনুপম গুনাবলি সম্পর্কে বলেন,

"রাসূলুল্লাহ বেমানান খাটো বা দীর্ঘ আকৃতির কোনোটাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন এ দু'য়ের মাঝামাঝি অত্যন্ত মানানসই মধ্যম দেহবিশিষ্ট পুরুষ।

তাঁর চুল একেবারে কোঁকড়ানো ছিলো না, আবার একেবারে সোজা খাড়াও ছিলো না; বরং তা ছিলো এ উভয়ের সমন্বয়ে খুবই সুন্দর রূপবিশিষ্ট।

তাঁর গণ্ডদেশে অতিরিক্ত মাংস ছিলো না। চিবুক খর্ব ও কপাল নীচু গড়নের ছিলো না। তাঁর মুখমণ্ডল ছিলো গোলাকার এবং দেহের রঙ ছিলো গোলাপি ও বাদামি রঙে সংমিশ্রিত। চোখের পাতা লম্বাটে গড়নের, সন্ধিসমূহ এবং কাঁধের হাড্ডিগুলো ছিলো বড় আকারের।

বুকের উপরিভাগ থেকে নাভী পর্যন্ত ছিলো স্বল্প পশমবিশিষ্ট একটি হালকা বক্ষরেখা, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিলো কেশমুক্ত। হস্ত ও পদদ্বয় ছিলো মাংসল। পথ চলার সময় তিনি সম্মুখভাগে একটু ঝুঁকে পা উঠাতেন এবং এমনভাবে চলতেন যে, তাঁকে দেখে মনে হতো- তিনি যেন কোনো ঢালু পথ অতিক্রম করছেন। তিনি যখন কারো প্রতি লক্ষ্য করতেন, তখন তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে মনোযোগী হতেন। তাঁর পৃষ্ঠদেশে উভয় স্কন্ধের মধ্যভাগে ছিলো মোহরে নবুওয়াত।

রাসূলুল্লাহ ছিলেন সর্বশেষ নবী। দানশীলতা, সাহসিকতা এবং সত্যবাদিতায় তিনি ছিলেন সবার চেয়ে অগ্রগামী। তিনি ছিলেন সর্বাধিক আমানতের হেফাজতকারী এবং

অঙ্গীকার পূর্ণকারী। সাথীদের মাঝে তিনি ছিলেন সবচেয়ে কোমল স্বভাবের এবং সবার চেয়ে বিশ্বস্ত সহচর ও আস্থাভাজন সঙ্গী। সহসা কেউ তাঁর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হলে ভয়ে সে ব্যক্তির অন্তর কম্পিত হতো। আর কেউ তাঁর সঠিক পরিচয় লাভ করতে পারলে খুবই আন্তরিকতার সাথে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতো। "৩৭৬

জাবির ইবনে সামুরাহ রাযি. বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ এর মুখমণ্ডল ছিলো প্রশস্ত, চক্ষুদ্বয় ছিলো হালকা লাল বর্ণের এবং পায়ের গোড়ালি ছিলো পাতলা।

৩৭৬. ইবনে হিশাম: ১/৪০১-৪০২ পৃ.। সুনানে তিরমিযী (তুহফাতুল আহওয়ায়ীসহ): ৪/৩০৩ ৩৭৭. সহীহ মুসলিম: ২/২৫৮

বারা (রাযি.) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর দৈহিক গঠন ছিলো মধ্যম ধরনের। উভয় কাঁধের মাঝে দূরত্ব ছিলো এবং কেশরাশি ছিলো দুই কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সৌন্দর্যমণ্ডিত পোশাকাদি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে সুন্দর কোনো কিছু আমি দেখিনি।"৩৭৮

রাসূল অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় কথা বলতেন। কথা বলার সময় পরিচ্ছন্ন বাক্য বিন্যাসের ব্যবহার ছিলো তাঁর এক অসাধারণ গুণ। তিনি উঠাবসায় সর্বদা আল্লাহর জিকির করতেন। তিনি ছিলেন কুমারী নারীর চেয়েও অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল। তিনি যখন কোনো কিছু অপছন্দ করতেন, তখন তা তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেতো। তিনি দৃষ্টি অবনত করে রাখতেন। তাঁর আচার-আচরণে অহংকারের লেশমাত্রও ছিলো না। তিনি খুব সাদাসিধে এবং সাধারণভাবেই জীবনযাপন করতেন। নিজেই নিজের জুতো সেলাই করতেন। সংসারের কাজকর্ম নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন। নিজেই কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতেন। নিজের সেবকদের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে "উহ" শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করতেন না; বরং তাদের কাজে সাহায্য করতেন। যখন দু'টি বিষয়ে তাঁকে এখতিয়ার দেওয়া হতো বা দু'টি কাজের সুযোগ তাঁর সামনে আসতো; তিনি সহজতর কাজটি গ্রহণ করতেন। অন্যায় কাজ হলে সবার আগে তিনিই তা থেকে বিরত থাকতেন। এককথায় মানুষের মাঝে উত্তম চরিত্রের যত গুণাবলী থাকতে পারে, সকল গুণই তাঁর মাঝে ছিলো; যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আয়েশা (রাযি) কে রাসূল এর আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন- كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ "পবিত্র কুরআনই হচ্ছে তাঁর আখলাক।"

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ যা কিছুই আদেশ করেছেন, রাসূল '(সাঃ)ই ছিলেন এর উপর সর্বোত্তম আমালকারী। আর মহান আল্লাহ যা কিছু নিষেধ করেছেন, একমাত্র রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'ই পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সেসব কাজ থেকে বিরত রেখেছিলেন।

৩৭৮. সহীহ বুখারী: ১/৫০২

তাঁর সর্বোত্তম আদর্শের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন- وَإِنَّكَ لَعَلَى
خُلُقٍ عَظِيمٍ) "আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন। "৩৭৯
বাস্তবিকই আমাদের জন্য রাসূল এর জীবনচরিতের মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন

-لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا" )

বস্তুত আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ- এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। "৩৮০
মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূল এর উত্তম আদর্শের অনুসরণ করে জীবন চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

৩৭৯. সূরা কলাম: ৪ ৩৮০. সূরা আহযাব: ২১

# উপসংহার

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুরো জীবনীর মাঝে রয়েছে আমাদের জন্য অসংখ্য- অগণিত শিক্ষা। সুতরাং আমরা যদি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহকে যথাযথ ভাবে আঁকড়ে ধরি; তবেই তাঁর যথার্থ অনুসরণ সম্ভব হবে।